জিপসীর পায়ে পায়ে
শ্রীপান্থ

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

বন্ধুবরেষু

শহরের একপাশে ঘুমিয়ে-থাকা রেলপথটির বাঁয়ে শূন্য জমিটা হঠাৎ জনপদ হয়ে গেল। দুপুরেও দুটি নিঃসঙ্গ গাছ, স্তূপীকৃত জঞ্জাল, আর দুটি রুগ্‌ণ কুকুর ছাড়া কেউ ছিল না সেখানে, কিছু ছিল না। কোনও জাদুকরের হাতের ছোঁয়ায় যেন, সন্ধ্যায় সেই পতিত জমি জমজমাট এক উপনগরী। মাঠময় ছোট ছোট তাঁবু। চারদিকে ছড়িয়ে আছে থলি ঝুলি প্যাঁটরা, হাঁড়িকুড়ি, লোকজন। গাছতলায় ক'টি গাধা ঝিমুচ্ছে। মাঠের মাঝখানে জ্বলছে ধুনো। তার চারপাশে বসে ক'টি মেয়ে-পুরুষ। পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে গুটিকয় কুকুরছানা। দুটি বাচ্চা ছেলে ওদের ঘুম ভাঙাবার চেষ্টায় আছে। একজন জোয়ান মরদ অচেনা ভাষায় কী যেন একটা গান গাইছে। হয়তো অন্য কোনও ভাষায় সেই—'পা বিবির সিন কুররেলার'...।—'যদি তুমি কোনও কাজ করতে না-চাও, তবে চলে এসো আমাদের সঙ্গে'—দেখবে কত মজাদার হতে পারি আমরা!...বিখ্যাত সেই গানটি। অথবা—'দোহনে জোনে টায়ার গ্যান কালে তাখা...!'—তোমার কালো চোখ আমায় খেল,...আমায় খেল!...

হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন কোনও পরাজিত বিধ্বস্ত পলাতক সৈন্যবাহিনী। শতচ্ছিন্ন বিবর্ণ তাঁবু। স্বাস্থ্যহীন গর্দভ। জীর্ণ পোশাক পরিচ্ছদ। কিন্তু সে পলকের জন্য। পরক্ষণেই যখন রঙিন ঘাঘরা দুলিয়ে, ঠুনঠুন কাচের চুড়ি বাজিয়ে, পায়ের মলে বোল তুলে সেই ছিন্ন তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসে স্বপ্নলোকের মানবী, তখন মনে হয় তাঁবুর এই উপনগরী হয়তো-বা কোনও ছদ্মবেশী সুলতান অথবা শৌখিন নৃপতির বিশ্রাম শিবির। বিলাসী সুলতান ভিখারির বেশে প্রমোদ ভ্রমণে বের হয়েছেন। সঙ্গে তাঁর বেগম বাইজি, আমির ওমরাহ্‌। বাইরের দুনিয়াটা একবার নিজের চোখে দেখবেন বলেই ওঁরা এভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হারেমের রূপসীরা দিনভর দুয়ারে দুয়ারে সওদা ফিরি করেছে ; ওষুধ বিলি করেছে, কাচের চুড়ি বেচেছে, বাবু আর বিবিদের হাত দেখেছে। পুরুষেরা কেউ কারিগর সেজে কাজের ধান্ধায় ঘুরেছে, কেউবা হয়তো ডুগডুগি বাজিয়ে ভালুক নাচ দেখিয়েছে। ওরা আসলে কিছুই করেনি কিছুই দেখায়নি। দেখাবার ছল করে দু' চোখ ভরে শুধু

দেখেছে। দেখেছে এই দুনিয়ার কোথায় কী রং, কোথায় কী রূপ। দিনশেষে তাঁবুতে ফিরে এবার বোধহয় তাই নিয়েই আলোচনা চলছে। থেকে থেকে ভেসে আসছে খিল-খিল হাসির টুকরো।

যদি কান পাতা যায় তবে হয়তো অনেক কথাই শোনা যাবে। কোঠাবাড়ির সেই দুঃখী বউটির কথা, যার মনে সুখ নেই ; অল্পবয়সি একটি বাবুর কথা, যে না চাইতেই অনেক পয়সা গুঁজে দিয়েছে জিপসী মেয়ের হাতে, ইশারায় আর কোনও দিন আবার যেতে বলেছে। শোনা যাবে, ছোট্ট একটা হুকোয় তামাক টানতে টানতে বুড়ো দাদু ছোটদের কাছে অনেক কাল আগে, সেই যখন এই দুনিয়ায় প্রথম মানুষ জন্মায় তখন কী সব কাণ্ড হয়েছিল তার সব বিচিত্র গল্প বলছে। বলতে বলতে হঠাৎ তার জিজ্ঞাসা—বল দিকিনি, কোন্ সে বস্তু যা সব সময় সবারই একসঙ্গে বাড়ছে? তারপরই হাসতে হাসতে, কাশতে কাশতে নিজেই সে উত্তর দিচ্ছে—ওমর—বয়স। বুড়োর কথা শুনে কোলের কুকুরটাকে কোলে রেখেই তার কাছ ঘেঁষে বসল একটি তরুণী।—আচ্ছা, তুমি বল দিকি, কাউকে জিজ্ঞেস না করে কে রানির খাস কামরায় ঢুকে যেতে পারে? ওর কথা শুনে বুড়ো মিটমিট করে হাসে। সে-ই শিখিয়েছিল ধাঁধাটা। সুতরাং, খানিক ভেবে মাথা চুলকে বলল—না জানে। জানি না। চাম্।—সূরয!—ধূপ!—সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ছুড়ে দিল মেয়েটি। তারপর ভেঙে পড়ল খিলখিল হাসিতে।

কেউ গল্প বলছে, কেউ রান্না করছে, কেউ গাধার সেবাযত্ন করছে, কেউ বা গলা ছেড়ে আপন মনে গান গাইছে। পোড়া কাঠের গন্ধ, অস্পষ্ট আলো অপরিচিত ভাষায় অনুচ্চ কাকলি, চুড়ির ঠুনঠুন, অজ্ঞাত গানের ভাসমান একটি কলি। সব মিলিয়ে দর্শকের চোখের সামনে বিচিত্র এক রহস্যলোক। দারিদ্র, সে যেন নিছক ছলনা। এ শিবিরে যারা নিশিযাপন করছে তারা কি সত্যিই ছন্নছাড়া ভিখারির দল? নাকি, প্রত্যেকেই ওরা রাজা রানি? সুদর্শন ওই তরুণ হয়তো কোনও কোটালপুত্র, আর এই তরুণী, কে জানে, হয়তো কোনও মন্ত্রীনন্দিনী!

এক সপ্তাহও কাটল না। ভালো করে দেখতে না দেখতে, কারও সঙ্গে চেনাজানা হতে না হতে হঠাৎ একদিন সব উধাও। তাঁবু, গাধা, ভালুক, কুকুর এবং রহস্যময় সেই মানুষগুলো—কেউ নেই, কিছু নেই। কিছু পোড়া ঘাস, কিছু ছাই, আর এখানে ওখানে ক'টি গর্ত—চিহ্ন বলতে এটুকুই পড়ে আছে। আর সব অদৃশ্য। হয়তো ক'দিন আগেও যারা ছিল এই গঙ্গাতীরে, আজ তারা হাজারিবাগের কোনও ছোট্ট শহরের এক কোণে। ক'সপ্তাহ পরে তাদেরই হয়তো দেখা যাবে মহীশূরের চন্দন বনে, কিংবা কাশ্মীরের শালিমার বাগানে। আবার

একই সময়ে একই তাঁবুর উপনগরী হয়তো গড়ে উঠছে আফগানিস্তানের রুক্ষ উপত্যকায়, হারুন-উল-রসিদের শহর বোগদাদের প্রাচীন মসজিদটির পেছনে, প্যালেস্টাইনের মরুভূমিতে কোনও খেজুর বনে। হয়তো-বা আরও দূরে, যুগপৎ একই মায়ালোক প্যারিসের শহরতলিতে, স্পেনের পর্বত কন্দরে, ব্রিটেনের সবুজ স্নিগ্ধ গ্রামাঞ্চলে, নিউইয়র্ক কিংবা ক্যালিফোর্নিয়ার আলো-ঝলমল পথে।

চলতে চলতে থমকে দাঁড়াতে হয়। বিশেষত ভারতীয় দর্শককে। অতিব্যস্ত রাজপথের ধারে অর্ধবৃত্ত রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে দশ-পনেরোটি বাড়ি। ও-গুলো যে আসলে আর পাঁচটা বাড়ির মতো নয়, এ বাড়ি যে যখন-তখন হাঁটতে শুরু করতে পারে, সেটা বোঝা যায় উঁচু উঁচু চাকাগুলোর দিকে তাকালে। আজকাল শিকড়যুক্ত গেরস্থও মাঝেমধ্যে ছুটির দিনে গাড়ির সঙ্গে বাড়ি জুড়ে বেরিয়ে পড়েন শহর থেকে। শহরতলির কোনও মনোরম এবং নির্জন এলাকায় এসে ছাউনি পাতেন। কিন্তু সামনের ওই গাড়িগুলোর চেহারা থেকেই স্পষ্ট, এগুলোর মালিকরা অন্য জাতের। গাড়ির পেছনে বেশ বড়সড় দুই পাল্লার দরজা, ধারে তিনটি জানালা। ছাদটি যদিও ধবধবে সাদা, কিন্তু দরজা-জানালা এবং গায়ের রঙে উজ্জ্বল আদিমতা। এই রং দর্শককে টেনে নিয়ে যায় অস্থায়ী সেই উপনিবেশের দিকে।

অনধিকারীর পায়ের শব্দে একসঙ্গে কয়টা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। যেন বুনো কুকুর। খাড়া খাড়া মোটা লোম, হলদেটে রং। আশ্চর্য, কুকুরগুলো কিন্তু তেড়ে এল না। যে যেখানে ছিল সেখানে দাঁড়িয়েই ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। সে আওয়াজে কোনও ব্যস্ততা নেই, বন্যতা নেই। তাদের হাঁক শুনে পিছনে ফিরে তাকাল একটি মানুষ। তার পরনে ঢিলে প্যান্ট, গায়ে ওয়েস্টকোট, পায়ে কালো বুট। সে জুতোয় কোনও দিন বুরুশ পড়েছে বলে মনে হয় না। মানুষটির বয়স কত হবে বলা শক্ত। মাথার চুলে পাক ধরেছে বটে, কিন্তু মজবুত শরীর। আস্তিন গুটানো হাতের কবজি বেশ চওড়া। এতক্ষণ সে কাঠ কাটছিল। বোধহয় রাত্তিরের খাদ্য প্রস্তুতের জন্য আগুনের ব্যবস্থা করছিল আশ্চর্য, সেও কিন্তু এক পা নড়ল না। দর্শকদের দিকে একনজর তাকিয়ে আবার মন দিল নিজের কাজে।

তখনও সন্ধ্যা হয়নি। এরই মধ্যে নীল ধোঁয়া উঠেছে আকাশে। গাড়ির ব্যূহের আড়ালে যে উঠোন তার ঠিক মাঝখানে আগুন জ্বলছে। হালকা ওড়নার মতো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে উপনিবেশের মাথার উপরে। তার তলায় আগুনের ধারে বসে আছে তিন-চারটি মেয়ে। বর্ণাঢ্য তাদের পোশাক। উজ্জ্বল লম্বা ঘাঘরা আর ঢিলে ব্লাউজে প্রত্যেকে যেন রূপকথার দেশের নারী। পাকা গমের মতো গায়ের রং তাদের। বড় বড় চোখ, সাদা দাঁত। প্রায় সবারই গলায়, হাতে এবং কানে গহনা; সবারই লম্বা

কালো চুল বিনুনি করে বাঁধা। একটি মেয়ে একটা গাড়ির সিঁড়ির ধারে বসে মাটি আর ঘাস দিয়ে বাসন মাজছে। তার বাহারি ঘাঘরা লুটিয়ে পড়েছে চারপাশের ঘাসে। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন একটি ফুল। একটি বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মায়ের কাজ দেখছে আর মাঝে মাঝে দেখছে আমাদের। ওদিকে আর কয়টি ছেলেমেয়ে খেলছে। তাদের সবার পা খালি, জামাকাপড় অতি সাধারণ। একজনের কোটটি দু'তিন জায়গায় ছেঁড়া। তাতে কারও কোনও অসুবিধা হচ্ছে বলে মনে হয় না। যদিও গ্রীষ্ম চলছে, কিন্তু বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা। ওরা তারই মধ্যে দিব্যি খালি পায়ে ছুটছে, খেলছে, ঘাসে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

এই দৃশ্যটা দেখেছিলাম সুদূর ওয়েলস্-এ। তার কয় সপ্তাহ পরে হঠাৎ প্যারিসের রাস্তায় প্রায় একই দৃশ্য। রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে এক ঝাঁক মেয়ে-পুরুষ। বর্ণাঢ্য এক শোভাযাত্রা যেন। মেয়েদের পরনে রৌদ্রের উজ্জ্বল স্কার্ট, আর ঘাঘরা নেমে গেছে গোড়ালি অবধি। পায়ে মোটা মোটা রুপোর মল। গায়ে ছোট ঢিলে চোলি। কারও গলায় বড় বড় পুঁতির মালা, কারও মালায় মোহর কিংবা রুপোর মুদ্রা। কানে মস্ত রিং। তবু পোশাক আর গহনায় চোখ আটকে থাকতে চায় না, এসব তুচ্ছ করে চোখের সামনে ফুটে বেরিয়ে আসে ওদের আশ্চর্য সুন্দর গড়ন, সহজ স্বাভাবিক রূপ। সেই কালো চোখ, কালো চুল, সেই মুক্তোর মতো সাদা দাঁতের সারি। অনেকেই অতএব ওদের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে। কেউ কেউ যেতে যেতে ফিরে তাকাচ্ছেন বার বার। দোষ তাঁদের নয়। এ রূপ সত্যিই মানুষকে নির্লজ্জ করে তোলে।

সমান দর্শনীয় পুরুষরাও। দীর্ঘ মজবুত গড়ন। কেউ কেউ অবশ্য একটু মোটা হয়ে গেছে। কিন্তু প্রত্যেকের চোখে মুখে যেন আদিম তীক্ষ্নতা। কারও পায়ে বুট, কারও পা খালি। প্রত্যেকের মাথায় টুপি। একজনের হাতে একটি বেহালা। আর একজনের কোটের বুকে একটি রুপোর চেন ঝুলছে, কোথাও বোধহয় একটি ঘড়ি লুকিয়ে আছে। হঠাৎ ওরা থেমে গেল। বেশ উঁচু গলায়ই নিজেদের মধ্যে কী পরামর্শ করল। তারপর রাস্তার একপাশে রঙিন ত্রিপলের তলায় সাজানো কাফের চেয়ারগুলোর উপর নিজেদের ছুড়ে দিল। দোকানের লোকেরা কিছু বলারও সুযোগ পেল না। তার আগেই এক ঝাঁক পাখির মতো ওরা গোটা রেস্তোরাঁটার সর্বত্র ছিটিয়ে পড়েছে। প্রত্যেকটি চেয়ারে বসে একজন করে জিপসী। পথচারীর দল সকৌতুকে অভাবিত সেই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে।

প্রতি মুহূর্তে নিশ্চয় এমনি আরও অনেক দৃশ্য দেখা যাচ্ছে বিশ্বময়। কেননা, ভুবনময় ছড়িয়ে আছে ওরা। সে-ই এক মানুষ, কমবেশি এক পোশাক, এক ধরনের

আচার। কোনোও দল হয়তো অশ্বারোহী, মাথার উপরে খোলা আকাশ ছাড়া তাদের আর কোনও আশ্রয় নেই। কেউ কেউ থাকে তাঁবুতে, মধ্যযুগের সৈন্যরা যেমন ছোট ছোট অনুচ্চ তাঁবু ব্যবহার করত, তেমনই আদিম আশ্রয়ে। কোনোও দল বাস করে খড়কুটো বা ঘাসপাতায় গড়া ছোট ছোট আস্তানায়, কোনও কোনও দল ঘোড়ায় টানা বড় বড় গাড়িতে, অনেকে আবার মোটর ভ্যানে। ক্যারাভ্যান চলেছে।

বাহনে মিল নেই। আগেই বলেছি, কিছু কিছু গরমিল আছে অন্যান্য বিষয়েও। কিন্তু সেসব বাইরের ব্যাপার। মূলত ঘোড়ার পিঠে বসা আর মোটগাড়ির স্টিয়ারিংয়ে হাত রাখা মানুষটি জীবনে এক। রাইন অথবা গঙ্গাতীরে, ভল্‌গা কিংবা মিসিসিপির ধারে চলমান জিপসী-জীবন প্রায় অভিন্ন। কেউ নাচে গায়, কেউ মিস্ত্রির কাজ করে, কেউ ঘোড়ার সওদাগর কেউ বা ভালুকের বাজিকর। মেয়েরা সর্বত্র টুকিটাকি জিনিস অথবা ওষুধ ফেরি করে, আর হাত দেখে। কেউ কেউ অবশ্য নেচে গেয়েও রোজগার করে। আমরা যখন একদলকে প্যারিসের সম্ভ্রান্ত রেস্তোরাঁয় হানা দিতে দেখছিলাম, আর একদল হয়তো তখন স্পেনের কোনও এক শৌখিন রেস্তোরাঁয় সেজেগুজে গলা ছেড়ে গান ধরেছে :

মি হ্যাজ ডেসপ্রিসিয়াডো পর পব্‌রে
ই চুয়াত্রো প্যালাসিওস টেঙ্গো,
এল আসিলিও, এল হসপিটাল্‌
লা কারসেল ই এল সিমেনটেরিও!—আমার চার চারটে মস্ত প্রাসাদ রয়েছে। তোমরা অবশ্য বলো আমি ভিখারি, আমি তস্কর। কিন্তু আমার হাসপাতাল আছে, আমার জেলখানা আছে,—আমার গির্জা আছে, কবর আছে!

গতকালও একই গান গাইত ওরা। গাইত গত শতকেও। ওই ছিন্ন তাঁবুর অড্ডায়, এই ভাঙা গাড়ির চাকায় সময় আপন পরিমাপ হারিয়ে যেন এক বিভ্রান্ত নির্বোধ দাসে পরিণত। যে দৃশ্য আজ তার চোখের সামনে, নির্বাক মহাকালের আবছা মনে পড়ে সে যেন শত শত বছর আগেও ঠিক এমনই ছিল। হুবহু এক। কবে আর কোথায় তা দেখা গেছে, প্রশ্ন সেটাই। রহস্য সে কারণেই আরও ঘন। ধুলোয় ধুলোয় আচ্ছন্ন মানুষগুলি বুঝি সেই কারণেই আরও আকর্ষণীয়।

যে-মানুষ আজ বাগবাজারের খালের ধারে আবর্জনাকুণ্ডে সংসারী সম্রাট, সে-ই মানুষই হয়তো গত শতকে ছিল সিন্ধুতীরে, চারদিকে একই শ্রীহীন সংসার ছড়িয়ে। একদা ছিল ইরানে, দুই শতক পরে সে-ই হয়তো আরমেনিয়া কিংবা আজারবাইজানে। পূর্ব বাংলায় কোনও এক বেদের মেয়ে মহুয়া যখন নদের ঠাকুরকে পাগল করে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, দূর স্কটল্যান্ডের জনৈক লর্ডের তরুণী গৃহিণী তখন আর

এর বেদের মেয়ে জনি ফে'র গান শুনে বেরিয়ে পড়েছেন প্রাসাদ থেকে। নদের ঠাকুর কী করেছিলেন তা অনেকেরই জানা। পূর্ববঙ্গ গীতিকারের ভাষায় :

রাত্রি নিশাকালে ঠাকুর কী কাম করিল।
বেদের নারীর ল্যাগা ঠাকুর বিদেশে চলিল।
কীসের গয়া, কীসের কাশী, কীসের বৃন্দাবন।
বেদের কন্যার লাগি ঠাকুর ভ্রমে ত্রিভুবন।।

লর্ড-গৃহিণীর সন্ধানে পনেরো জন ঘোড়সওয়ার নিয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়েছিলেন লর্ড। অনুগত সঙ্গীরা প্রাণ দিয়েছিল বড় ঘরের মান বাঁচাতে। কিন্তু ফেরানো গেল না পলাতকাকে। তিনি তখন জিপসীদের আড্ডায় বসে গান গাইছেন : ওয়ান্স আই কুড লে অন দি বেড,—দি বেস্ট ফেদার বেড এভার মেড; বাট্ নাউ আই অ্যাম প্ল্যাড জাস্ট টু লে অন দি সড!—এক সময় আমি নরম পালকের শয্যায় শুতাম, আজ এই মাটির শয্যায়ই আমি সুখী!

এসব ঘটনা কয়েকশো বছর আগে না ঘটে গতকালও ঘটতে পারত। কেননা, ওরা শতকের হিসাবে কাল মাপে না, কাল পরিমাপের জন্য ওদের কোনও পঞ্জিকা নেই, হিসাবের খাতা তথা ইতিহাস নেই। আকাশে যেমন পাখির ঝাঁক, মানুষের ইতিহাসে তেমনই। এই ভ্রাম্যমাণ মানুষ। শত শত বছর আগে যে গান গেয়ে ভালুক নাচাত বলকানের খেলোয়াড়, এখনও ডুগডুগি বাজিয়ে সে-গানই গেয়ে চলেছে পশ্চিমের বাজিকর,—ড্যান্স ও লিটল মার্টিন, ড্যান্স। নাচ রে মার্টিন,—নাচ। অ্যাটলান্টিকের এপারে ওপারে হাজার বছর পরে এখনও একই ভালোবাসার গান গাইছে সেই ঘাঘরা-পরা কালো-হরিণ-চোখ মেয়েরা :

সি মিরি চুমুয়া সান কুসতি তো হা
তু নাস্তি হ্যাচ বোকালো, দেরাই আজা!

—যদি আমার চুমু খেতে ভালো লাগে তোমার, তা হলে আর বেশিদিন না-খেয়ে কাটাতে হবে না,—হে বন্ধু আমার!

সে এক বিস্ময়কর, বিচিত্র ইতিহাস। ঝাঁক ঝাঁক পাখি শত শত বছর ধরে উড়ে বেড়াচ্ছে আকাশে। একই পাখি, একই রং, একই সুর,—একই গান। কিন্তু তবু যেন কেউ কাউকে জানে না। আপন ডানায় ভর করে, আপন নেশার ঘোরে সবাই স্বতন্ত্র যাত্রী। ক্লান্তিহীন, লক্ষ্যহীন। উদ্দাম, অপরিবর্তনীয়,—স্বাধীন। কেন ওরা একদিন ডানা মেলেছিল, কেন ওরা অনন্তকাল ধরে এমনি উড়ে বেড়াচ্ছে, কেন ওরা কেবল উড়বেই, কেউ তা জানে না। এই মুহূর্তে বিশ্বে জিপসী আছে নাকি এক কোটি কুড়ি লক্ষ। ক'বছর আগে একটি হিসাবে দেখেছিলাম রাশিয়ায়

তাদের সংখ্যা নাকি প্রায় দশ লক্ষ। দুই লক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ করে আছে বুলগেরিয়া, রুমানিয়া এবং হাঙ্গেরিতে। যুগোশ্লাভিয়ায় আছে এক লক্ষ ষোলো হাজার, পোল্যান্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়ায় আছে দেড় লক্ষ করে। তুরস্ক আর গ্রিসে আছে আরও লাখ দুই। ইউরোপের অন্যান্য দেশে, বিশেষত ফ্রান্স, জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ায়ও আছে বেশ কিছু সংখ্যক। আমেরিকায় বিস্তর। ব্রিটেনে জিপসী নাকি পঞ্চাশ হাজার, আমেরিকায় এক থেকে দুই লক্ষ। এসব হিসাব অবশ্য চূড়ান্ত নয়। তা হলেও ভবঘুরেদের দুনিয়া সম্পর্কে অনুমানের পক্ষে অবশ্যই সহায়ক। এদের সঙ্গে যদি এদেশের আরও লাখ পঞ্চাশেক যাযাবরকে যোগ করা যায়, তাহলে যে চিত্রটি ফুটে ওঠে সেটা চমকপ্রদ এবং কৌতূহলোদ্দীপক বইকি! অথচ আজব ব্যাপার, ওদের কোনও কৌতূহল নেই নিজেদের সম্পর্কে। আমাদের আপন অঙ্গনে ভ্রাম্যমাণ যাযাবরদের মতোই ইতিহাস বিষয়ে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ইউরোপ ও আমেরিকার জিপসী। ওরা শুধু জানে :

—ময় হু কালো!

—মান্ডে হে দাদেসক্রো ওয়াৎস!

—ময় হু সাচো পাসকেরো রোম!

—অর্থাৎ—

—আমি কালো।

—আমার পিতৃভূমি আছে।

—আমি একজন সাচ্চা রোম।—খাঁটি মানুষ।

— কোথায় তোমাদের পিতৃভূমি?

অচেনা মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন সতর্ক নগরপাল। সে ১৪২৭ সনের এক আগস্ট দিনের কথা। হঠাৎ যেন শূন্য থেকে প্যারিসের তোরণে আছড়ে পড়েছে এক দঙ্গল মানুষ। নর, নারী, শিশু। অদ্ভুত তাদের চেহারা, অদ্ভুত কথাবার্তা। কলকাকলি-মুখরিত একঝাঁক বুনো মুরগি যেন। পুরুষদের মাথায় পাগড়ি, মেয়েদের মাথায় মেঘের মতো কালো চুল। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ওদের চোখ। ইউরোপের গভীরতম হ্রদের চেয়েও গভীর যেন সে চোখ! যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনই উজ্জ্বল। কিন্তু তৎকালের ইউরোপীয় শহর,—চোখের মায়ায় পড়ে নগররক্ষকের কর্তব্য ভুলে গেলে চলে না। উৎকণ্ঠিত নগরপাল অতএব পথ আটকে দাঁড়ালেন। তিনি জানতে চাইলেন—কী চাও তোমরা?—আর, তোমাদের পিতৃভূমিই বা কোথায়?

দলের মধ্য থেকে বয়স্ক একজন এগিয়ে গেল। পরনে তার লাল সবুজ আর হলুদে মিলিয়ে তৈরি গ্রীষ্মের রোদ্দুরের মতো উজ্জ্বল পোশাক। হাতে পাথরখচিত উজ্জ্বল গহনা। বহু কষ্টে হাত-পা নেড়ে সে বোঝাতে চাইল তার মর্ম : আমি লর্ড প্যানুয়েল। আমি লিটল ইজিপ্টের ডিউক। আর আমার সঙ্গে ওই যে জোয়ানটিকে দেখছ, সে টমাস। টমাস লিটল ইজিপ্টের আর্ল। আমাদের সঙ্গে সাকুল্যে মানুষ আছে একশো কুড়ি জন। আমরা এই দেশের রাজার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি :— এই দেখ, আমাদের পরিচয়পত্র।

প্যানুয়েল তার কোমর থেকে এক টুকরো বিবর্ণ কাগজ বের করল। নগররক্ষকেরা অবাক হয়ে দেখলেন তাতে পোপের সিলমোহর। তলায় স্বাক্ষর করেছেন পোপ পঞ্চম মার্টিন স্বয়ং। তিনিই এই পরিচয়পত্র লিটল ইজিপ্টের ডিউক আর আর্লকে পাঠিয়েছেন ফরাসিরাজ অষ্টম চার্লসের কাছে।

রাজার সামনে গিয়ে ওরা বিনীতভাবে বলল—মহারাজ, আমরা পাপীর দল, তোমার কাছে আমরা ক্ষমা ভিক্ষা করতে এসেছি। রাজা হেরড যখন মা মেরিকে তাড়িয়ে ফিরছে, আমরা তখন প্যালেস্টাইনে ছিলাম। মেরি মাতা আমাদের কাছে

আশ্রয় চেয়েছিলেন কিন্তু দুষ্ট রাজার ভয়ে আমরা তাঁকে আশ্রয় দিতে সাহস পাইনি। আমরা তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। সেই পাপেই আমরা পতিত, ছন্নছাড়া মতো আজ এখানে কাল সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অতি সম্প্রতি আমরা আমাদের দেশ লিটল-ইজিপ্ট থেকেও বিতাড়িত হয়েছি। সারাসেনরা আমাদের ঘরছাড়া করেছে। বহু কষ্টে আমরা বোহেমিয়া আর জার্মানি হয়ে হাজির হয়েছিলাম পোপের দরবারে! মহামতি পোপ আমাদের ক্ষমা করেছেন। তিনি বলেছেন—তোমরা সাত বছর প্রায়শ্চিত্ত কর। এই সাত বছরে ইউরোপের প্রধান তীর্থগুলো তোমাদের পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে হবে। তবেই তোমাদের মুক্তি। আমরা তাঁর আদেশমতো তীর্থদর্শনেই বের হয়েছি মহারাজ।

ক' সপ্তাহ পরে একই কাহিনি শুনিয়ে গেল তারা অ্যামিয়েনসে। তারপর ক্রমে একের পর এক ইউরোপের আরও নানা শহরে। ইউরোপের রাজদরবারগুলোতে এক দশক ধরে অন্যতম আলোচ্য তখন লিটল ইজিপ্টের ডিউক আর তার অনুচরবর্গ।

কোনও কোনও অঞ্চলে অবশ্য আগন্তুকদের মুখে অন্য কাহিনিও শোনা গেল। রাশিয়ায় একদল বলে বেড়াতে লাগল—আমরা ফারোর লোক। ফারো যখন তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে লোহিতসাগর পার হচ্ছিলেন, তখন শত্রু এসে চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ফেলল। সবাই মরে গেল। একমাত্র বেঁচে রইল একটি জোয়ান মরদ। আর বেঁচে রইল একটি অপূর্বসুন্দরী তরুণী। তাঁরা দু'জনে মিলে ঘর বাঁধল। আমরা সেই ইজিপসিয়ানদেরই বংশধর।

—ইজিপসিয়ান বলেই কি তোমাদের এমন করে ঘুরে বেড়াতে হবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। শোনেননি, জ্যাকিয়েল বলেছেন—আই শ্যাল স্ক্যাটার দি ইজিপসিয়ানস্ অ্যামং দি নেশনস্!—আমি ইজিপসিয়ানদের ছত্রখান করে দেশে দেশে ছড়িয়ে দেব।

তারপর আর প্রশ্ন তোলা অবান্তর। ইউরোপ একবাক্যে মেনে নিল ওরা ইজিপ্টের মানুষ। পণ্ডিতেরা মাথা নেড়ে বললেন—হ্যাঁ, ওদের পোশাক, ওদের ভাষা, ওদের চালচলন সব ইজিপসিয়ানদের মতো বটে।

এই ইজিপসিয়ান থেকেই ক্রমে নাম হয়ে গেল ওদের—জিপসী। ইংরেজিতে শব্দটা প্রথমে ব্যবহার হয়েছিল ১৫৩৭ সনে। তারপর থেকে বিশ্বময় এই ভবঘুরেদের আর এক নাম জিপসী। ওদের গান জিপসী গান। ওদের নাচ জিপসী নাচ। ওদের মেয়ে—জিপসী মেয়ে! এমনকি আমাদের দেশেও ভবঘুরেদের পর্যন্ত আজ আর এক নাম—জিপসী। যাযাবরের অনেক প্রতিশব্দ আছে ভারতীয় ভাষায়; ভ্রমণশীল, গুমারকর, অস্থিরবাসী, ভাটাকনারা, হিন্দানারা, ওয়াগারা, পখিবাস, খানাবাদোস,

বেদে—ইত্যাদি। কিন্তু শিক্ষিত শহুরে মানুষের কাছে ভবঘুরে মাত্রই যেন আজ জিপসী! অথচ ইউরোপ-আমেরিকার জিপসী আর ভারতীয় যাযাবরদের মধ্যে মিল যেমন অনেক, দূরত্বও তেমনি বিস্তর। সে কথা পরে। আপাতত আমাদের আলোচ্য ইউরোপে সদ্যাগত ওই আগন্তুক।

ওরা ইজিপ্ট নাম জপ করতে করতে জিপসী হয়ে গেল বটে, কিন্তু ওরা আদৌ ইজিপ্টের লোক নয়। সেখানেও তারা পরদেশি। ওদের চেহারা বা আচার আচরণে মিশরের কোনও চিহ্ন নেই। তৃতীয়ত, মিশর থেকে দুনিয়ার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ার মতো সেদিন কোনও সহজ পথ ছিল না। অথচ জিপসী পায়ে-হাঁটা পথের পথিক। তার আচারে এবং উপকথায় জল প্রায় অনুপস্থিত। চতুর্থত, লিটল ইজিপ্টের ডিউক আর আর্লরা যেসব কাহিনি শুনিয়েছিল ইউরোপে সেদিন, সেগুলোই একমাত্র জিপসী উপাখ্যান নয়। নিজেদের সম্পর্কে এমনি আরও অনেক গল্প শুনিয়েছে ওরা সেদিনের পৃথিবীকে।

একদল বলেছিল—আমরা বাইবেলের মানুষ। জেনেসিস-এ কেইন-এর কথা আছে। আমরা সেই অভিশপ্ত মানুষটিরই উত্তর-পুরুষ। শোননি, প্রভু তাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—তুমি যখন মাটি চাষ করবে, তখন মাটি তার প্রাণদায়ী শক্তিকে তোমার সামনে প্রকাশ করবে না।—অ্যান্ড এ ভ্যাগাবন্ড শ্যাল দাউ বি অন আর্থ!—বসুন্ধরা আমাদের প্রতি অনুদার। তাই আমরা অসহায় ভবঘুরে।

ওরা যখন ইনিয়ে-বিনিয়ে ঐ গল্প ফেঁদেছে। অন্যদল তখন তাঁবুর সামনে বসে আগুন পোহাতে পোহাতে অন্য কাহিনি বুনে চলেছে :

আমরা তখন প্যালেস্টাইনে থাকি। ইশুয়া বেন মিরিয়ামকে সৈন্যরা ধরে এনে হাজির করেছে রোমান কারারক্ষকের কাছে। এই ইশুয়ারই পরে নাম হয়েছিল যিশু। সবাই চেঁচিয়ে উঠল—ওঁকে ক্রুশে দাও। কারারক্ষক বলল—বেশ, তাই হবে। সে দুজন সৈনিককে কাছে ডেকে আশিটা মুদ্রা গুনে দিয়ে বলল—যাও, খুব মজবুত দেখে চারটে পেরেক কিনে নিয়ে এসো। ওরা নাচতে নাচতে তক্ষুনি বেরিয়ে গেল।

প্রথমে ওরা দুজনে একটা সরাইখানায় ঢুকল। দু'জনে মিলে বসে বসে খুব মদ খেল। চল্লিশটা মুদ্রা তাতে খরচ হয়ে গেল। গ্রিকদের সেই বিখ্যাত টক মদ কিনা, তাই বড্ড দাম। তখন বিকেল হয়ে এসেছে। হঠাৎ ওদের মনে পড়ল—এই যাঃ, পেরেকগুলো তো এখনও কেনা হয়নি। দুজন সরাই থেকে বেরিয়ে টলতে টলতে পথে নামল। পথের এক পাশে এক বুড়ো ইহুদির কামারশালা। ওরা গিয়ে বলল—বুড়ো, কাল ভোরে ইশুয়া বেন মিরিয়ামকে ক্রুশে দেওয়া হবে। আমাদের এক্ষুনি চারটে পেরেক চাই। শুনে বুড়োর হাত কাঁপতে লাগল।

সে বলল—আমাকে দিয়ে এ কাজ হবে না বাবা! ওরা রেগে গিয়ে বুড়োর বুকে বর্শা চালিয়ে দিল। তখন সন্ধ্যা।

এবার ওরা গেল আর এক লোহা-মিস্ত্রির কাছে! গিয়ে বলল, দেখ, আমরা তোমাকে চল্লিশটি মুদ্রা দিচ্ছি, তুমি এক্ষুনি আমাদের বড় বড় চারটে পেরেক তৈরি করে দাও। লোকটি বলল—চল্লিশ মুদ্রায় তোমরা বড় পেরেক পাবে না। আমি চারটে ছোট ছোট পেরেক দিতে পারি। শুনে ওরা রেগে গিয়ে তার দাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল। লোকটি ভয়ে হাতুড়ি নিয়ে কাজে বসল। একজন সৈন্য হাপর চালিয়ে তাকে সাহায্য করতে লাগল। সে বলল—আরে ভাই, হাত চালাও। জানো না, কাল ভোরে আমরা ইশুয়া বেন মিরিয়ামকে ক্রুশে দিতে চলেছি। শোনা মাত্র লোকটির হাতের হাতুড়ি থেমে গেল। এর আগে যে কারিগরটিকে ওরা হত্যা করেছে, ঘরে ভেসে এল তার কণ্ঠস্বর—খবরদার আরিয়া, কক্ষনও এ-কাজ কোরো না, ওদের জন্য পেরেক তৈরি কোরো না, ওরা মিরিয়ামকে খুন করতে চলেছে।

আরিয়ার হাত থেকে হাতুড়ি খসে পড়ল। সে বলল—না ভাই, আমি তোমাদের জন্য পেরেক বানাতে পারব না। ওরা রেগে গিয়ে তার বুকেও বর্শা চালিয়ে দিল।

কিন্তু এবার উপায়? ততক্ষণে অনেক রাত হয়ে গেছে। জেলরক্ষক নিশ্চয়ই পেরেকের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন। মুদ্রাগুলো খরচ না-করে ফেললে হয়তো ওরা খালি হাতে ফিরে যেতে পারত। গিয়ে সব বলতে পারত। হয়তো তাতে মিরিয়ামও প্রাণে বেঁচে যেতেন। কিন্তু ওরা সরাইখানায় অর্ধেক মুদ্রাই উড়িয়ে দিয়েছে। এখন খালি হাতে ফিরে গেলে নির্ঘাৎ গর্দান যাবে। ভয়ে সৈন্য দুটি ছুটতে লাগল। তারা জেরুজালেম থেকে পালিয়ে যেতে চায়।

নগরের ফটকের বাইরে এক গরিব মিস্ত্রির তাঁবু। সে সবে তার সাজসরঞ্জাম সাজিয়ে বসেছে। এইমাত্র হাপরে আগুন দিয়েছে। রোমান সৈন্যরা তাকে ধরে পড়ল। যদি পেরেক মিলে যায় তবে আর দেশান্তরী হতে হয় না। ওরা লোকটির হাতে চল্লিশটি মুদ্রা গুঁজে দিয়ে বলল—এক্ষুনি আমাদের চারটে পেরেক তৈরি করে দিতে হবে ভাই। লোকটি মুদ্রাগুলো গুনে কোমরে রাখল। তারপর কাজে বসল। এক একটা করে পেরেক তৈরি হচ্ছে আর সৈন্যরা তা হাতে তুলে নিচ্ছে। এমনি করে তিনটে পেরেক তৈরি হয়ে গেল। চতুর্থটি যখন তৈরি হয়ে এসেছে তখন একজন সৈন্য মনের খুশিতে বলে বসল—ধন্যবাদ ভাই। অনেক কষ্ট দিলাম তোমাকে। জানো তো, এই পেরেক দিয়েই কাল মিরিয়ামকে ক্রুশে দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে সেই ছাউনিতে ভেসে এল নিহত কারিগরদের কণ্ঠস্বর। সৈন্যরা তিনটে পেরেক নিয়েই ছুটে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল। কেননা, আর ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই। রাত শেষ হয়ে এল। ওদের ফেরার কথা ছিল সন্ধ্যায়।

বিমূঢ় মিস্ত্রি চতুর্থ পেরেকটি নামিয়ে মাটিতে রাখল। তারপর তার ওপর ঠান্ডা জল ঢেলে দিল। গরম লোহা এভাবেই ঠান্ডা করতে হয়। কিন্তু এ কী? পেরেকটি কিন্তু জুড়াল না। কারিগর অবাক হয়ে দেখল, লোহা যেমন লাল ছিল তেমনি লালই রয়ে গেছে। বরং ক্রমে তার তেজ যেন বেড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগল পেরেকের গা দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সে কী তাপ আর আলো। সে-আলোয় অমাবস্যার অন্ধকারও দূর হয়ে যায়। তাঁবু গুটিয়ে কারিগর গাধার পিঠে মালপত্র চাপিয়ে তক্ষুনি সেখান থেকে ছুটে পালাল। জীবনে এমন দৃশ্য সে আর কখনও দেখেনি।

ছুটতে ছুটতে সে দুই বালির পাহাড়ের মাঝে এক উপত্যকায় এসে হাজির হল। সেখানে একটি কুয়ো ছিল। সে কুয়োর ধারে তাঁবু ফেলল। হঠাৎ আবার চারদিক আলোয় আলোয় ভরে গেল। লোকটি সভয়ে দেখল, সেই পেরেক তার তাঁবুর সামনে। তার গা থেকে তখনও ঠিকরে আলো বের হচ্ছে। মিস্ত্রি পাগলের মতো কুয়ো থেকে জল তুলে তার উপর ঢালতে লাগল। কিন্তু আগুন তবু নিভল না, আলো ক্রমে বেড়েই চলল। ক্রমে কুয়োর শেষ জল বিন্দুটিও নিঃশেষ হয়ে গেল। উপায়ান্তরহীন কারিগর সাহসে ভর করে পেরেকটিকে কোনওমতে বালিচাপা দিয়ে সেখান থেকে পালাল।

মরুভূমি পার হয়ে সে আরবদের একটি গাঁয়ে এসে পৌঁছাল। সেখানে গাধা থেকে নেমে সে কপালের ঘাম মুছল। তারপর আবার তাঁবু খাটাতে শুরু করল। বেচারার তখনও তাঁবু খাটানো হয়নি, এমন সময় হাতে একখানা পেরেক নিয়ে এক আরব এসে হাজির। লোকটি বলল—কারিগর, এই পেরেকটিকে যদি আমার গাড়ির চাকায় লাগিয়ে দাও তবে ভাল হয়। কারিগর যেই পেরেক ঠুকতে শুরু করেছে অমনি গাড়ি সমেত সেই আরব এক ফুৎকারে উড়ে গেল। গাড়ি, মানুষ—সব নিমেষে মরুভূমির ধুলোর সঙ্গে মিশে গেল। ব্যাপার দেখে মিস্ত্রির বুঝতে দেরি হল না, এ সেই অভিশপ্ত পেরেক। তক্ষুনি সে তল্পিতল্পা বেঁধে দামাস্কাসের পথে পা বাড়াল।

সেখানেও একই ব্যাপার। একজন পদস্থ ব্যক্তি এলেন একটি পেরেক হাতে করে। বললেন—আমার এই তলোয়ারের হাতলে এটি ঠুকে দাও তো বাছা! ঠোকামাত্র এবারও সেই চোখ ধাঁধানো আলো আর প্রচণ্ড তাপ। তারপর থেকে যুগের পর যুগ তার বংশধরেরা পালিয়ে পালিয়েই ফিরছে। বলতে বলতে জিপসী নিজেদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবে—আমরা সেই পলাতকদেরই সন্তানসন্ততি। সেই একটি পেরেকের ভয়েই আমরা দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছি।—শোননি, যিশুকে

ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল তিনটে পেরেকে! সবাইকে ক্রুশে দেওয়া হতো চার পেরেকে। যিশুর বেলায় তিনটে। তাঁর দুটি পা একসঙ্গে সাজিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছিল একটি পেরেকে।—কেন? কোথায় গেল আর একটি পেরেক? সেই হারানো পেরেকই তো আমাদের দুনিয়াময় তাড়িয়ে ফিরছে!

একজন বিশেষজ্ঞ বলেন—এই গল্পের সমর্থনে জিপসীরা ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তিতে সত্যই তিন পেরেকের ব্যবহার দেখাতে শুরু করে। তাঁর মতে চারটির বদলে তিনটি পেরেকে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তি প্রথম দেখা যায় বাইজানটাইন শিল্পে। বিশেষত তামার পাতে,—খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতকে। আর, তখন সেখানে ধাতু-শিল্পে জিপসীদের নাকি একচেটিয়া আধিপত্য।

কোনও কোনও দল গর্ব করে বলে—আমরা তবু একখানা পেরেক সরিয়েছিলাম, সে নিশ্চয় কম কথা নয়। অন্য দল বলে, পেরেক তো এল অনেক পরে, আমাদের পতনের কারণ তারও আগেকার পাপ।—হেরেডের আদেশে বেথেলহেমে যারা শিশুমেধে মেতেছিল তারাই আমাদের পূর্বপুরুষ। আমাদের পূর্বপুরুষদের হাত নিরপরাধ শিশুর রক্তে লাল। শুধু তাই নয়, চরম বিপদেও তারা মা মেরিকে সাহায্য করতে রাজি হয়নি, বরং তাদের পরামর্শেই যিশুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল জুডাস। আর এক দলের বক্তব্য : আসলে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ছিল খ্রিস্টের সঙ্গী। বিপর্যয়ের দিনে তারা এত মদ খেয়েছিল যে, কী ঘটতে চলেছে সেটা আদৌ বুঝতে পারেনি। ফলে প্রভুকে তারা রক্ষা করতে পারেনি। সে-কারণেই আমরা পাতক। আমাদের রক্তে অনেক, অনেক পাপ।—হে দেব, তুমি আমাকে আঘাত করো, আঘাত করো! গল্প শেষ করেই গলা ছেড়ে গান ধরবে মার্কিনি জিপসী : মার্‌মান দেব্‌লা, মার্‌ মান!

বাইবেলের সঙ্গে অন্যভাবেও যোগসূত্র স্থাপন করতে চেয়েছে তারা। আর একটি জিপসী উপকথা বলে :

মহাপ্লাবনের পর আমাদের পূর্বপুরুষ নোয়া তার সন্তানদের নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করেন। তাঁর এক ছেলের নাম চামো। আমরা এই চামোর অধস্তন পুরুষ। একদিন নোয়া মদ খেয়ে খুব মাতলামো করছিলেন। তাই দেখে চামো তাঁকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। নোয়া রেগে গিয়ে তাকে অভিশাপ দেন—তুমি দাসের জীবন যাপন করতে বাধ্য হবে। চামো দাস হল। আমরাও অনেককাল দাস ছিলাম। চামোর ভাইদের সন্তান-সন্ততিরা, বিশেষত জাফেটোর ছেলেরা আমাদের প্রতি খুবই নিষ্ঠুর ব্যবহার করত। আমাদের মধ্যে একজন, নাম তার টুবালো, লোহা আর ব্রোঞ্জ দিয়ে নানা জিনিস বানাতে পারত। সুতরাং ওরা চাবুক হাতে আমাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে লাগল।

একদিন আমরা বিদ্রোহী হলাম। ওরা আমাদের আর আটকে রাখতে পারল না। আমরা স্বাধীন হয়ে গেলাম। আমরা কালডি (কালডিয়া) নামে একটি দেশ জয় করে নিলাম। দেশটা আমাদের পক্ষে খুবই ছোট। আমাদের দলপতিরা এবং দলের প্রবীণ জ্ঞানীরা বললেন—তোমরা দু' দলে ভাগ হয়ে দু'দিকে ছড়িয়ে পড়। একটি দল আমাদের পুঁথিপত্র নিয়ে নৌকোয় চড়ে যাত্রা, করল পুবে, ভারতের দিকে। যাত্রার আগে শত শত গোষ্ঠীকে তারা শিখিয়ে দিয়ে গেল পথের সাংকেতিক নিশানা। ভবিষ্যৎবাণী করা হল—একদিন আবার আমাদের উত্তরপুরুষেরা একসঙ্গে মিলিত হবে।

যে দল ভারতে গেল তারা সঙ্গে নিয়ে গেল আমাদের ভাষা আর লোহা এবং সোনার কাজ। ভারত এগুলো আমাদের থেকেই পেয়েছে। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর আগে পথে দলের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। একটি গোষ্ঠী রেগে গিয়ে উলটো পথ ধরল। তারা গিয়ে হাজির হল কাল দেশে (মিশর)। একদল তখনও কালডিয়ামে বাস করছিল। সেখানে তারা অ্যাসিরিসদের (অ্যাসিরিয়ানস্) সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করল। সেখানে আমাদের দুজন রাজা ছিল। একজনের নাম পুডিলো, আর একজন তাঁর ছেলে, রোমানো নিরানো। আমরা বাবিলা (ব্যাবিলন) নামে এক মস্ত শহর গড়ে তুলেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন যুদ্ধ লেগে গেল। পারসিসদের রাজা সিরুসো (সাইরাস) আমাদের রাজ্য আক্রমণ করলেন।

কালডিয়া ছেড়ে আমাদের একদল বেরিয়ে গেল পুব দিকে, আর একদল চলে এল পশ্চিমে। পশ্চিমে আমরা প্রথমে ছিলাম পেলাসজি রাজ্যে (প্রাচীন গ্রিসে) এবং তার আশপাশে নানা দ্বীপে। আমাদের ভাইরা সকলের অনুমতি নিয়ে আবার ভারতের দিকে চলল। হাজার বছর আগে যাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, আবার সেখানে তাদের সঙ্গে দেখা হল।...ইত্যাদি। গল্প শেষ করে জিপসী রহস্যের হাসি হাসে। বলে—আরে ভাই, পর্বতের সঙ্গে পর্বতের দেখা সাক্ষাৎ হয় না, মানুষের সঙ্গেই মানুষের দেখা হয়!

কখনও কখনও ওরা নিজেদের ইহুদি বলেও নাকি পরিচয় দিত। প্রাচীন ঐতিহাসিকরা যখন বলছেন, ওদের আদি ঠিকানা আসিরিয়া, নুবিয়া, আবিসিনিয়া, অথবা কালডিয়া—ইত্যাদি যে-কোনও দেশের মধ্যে এক দেশে, ওরা নিজেরা তখন নাকি বলতে শুরু করে—আমরা ইহুদিদের নিকট-আত্মীয়! সুতরাং, ঐতিহাসিকরা আবার টীকা রচনায় বসে গেলেন। তাঁরা বললেন :

খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপে, বিশেষত জার্মানি এবং ফ্রান্সে ব্যাপক প্লেগ দেখা দেয়। সবাই বললেন—এই মহামারীর জন্য দায়ী ইহুদিরা। ওরাই ঝরনা আর কুয়োর জলে ব্যাধির বিষ মিশিয়েছে। তাই শুনে ক্রুদ্ধ জনসাধারণ ঝাঁপিয়ে

পড়ল ইহুদিদের উপর। তারা প্রাণভয়ে বনে পালিয়ে গেল। সেখানে তারা গোপনে একসঙ্গে মিলিত হল। জার্মানির পাহাড়ে যেসব বড় বড় গুহা আছে, সেগুলো তাদেরই কীর্তি।

সে যা হোক, পঞ্চাশ বছর পরে ওরা এবং ওদের ছেলেপুলেরা ভাবল যে এতদিনে নিশ্চয় লোকেদের রাগ পড়ে গেছে। তাছাড়া, শত্রুরা নিশ্চয় মরেও গেছে। ওরা বেরিয়ে এল। ইউরোপে তখন যুদ্ধ চলছে। ওরা যুদ্ধের সুযোগ নিল। কিন্তু বাইরের জগতে ওরা কী করে খাবে, সেই হল এক ভাবনা। নির্জনে তারা নানা পরাবিদ্যার চর্চা করেছে, নানারকম যৌগিক ক্রিয়াকলাপ রপ্ত করেছে, হাত দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করতে শিখেছে। এসব বিদ্যা প্রয়োগ করতে কোনও যন্ত্রপাতির দরকার হয় না। ওরা অতএব শূন্য হাতেই গৃহস্থ মানুষের পৃথিবীতে বেরিয়ে এল। তার আগে নিজেদের মধ্যে সভা করে তারা স্থির করল—সত্য পরিচয় দেওয়া ঠিক হবে না। এবার থেকে আমরা বলব—আমরা ইজিপ্টের লোক। মেরি মাতা এবং তাঁর পুত্র যিশুকে গ্রহণ করতে রাজি না হওয়ায় আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক রায় দিলেন : সেই থেকেই তারা ইজিপসিয়ান। ওরা ইচ্ছে করেই, পাঁচজনে যাতে বুঝতে না পারে সেজন্য সান্ধ্যভাষায় কথা বলে।

জিপসী এ কাহিনি শুনেও নাকি মাথা নেড়ে সায় দেয়। সে যে-কোনও একটা পরিচয় চায়। কেননা, তা না হলে অন্যরা খুশি নয়, সর্বত্রই গৃহস্থ মানুষ তার পরিচয় জানার জন্য ব্যাকুল। জিপসী সে পরিচয়ের সন্ধানে এমনকি ইতিহাসের সমুদয় অপবাদ কুড়িয়ে নিতেও রাজি। এই দুনিয়ার যত রকমের অন্যায় কিংবা অধর্মের কাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে, জিপসী তার সব দায়িত্ব মাথা পেতে গ্রহণ করতে সম্মত। খ্রিষ্টীয় যাজকেরা তাকে যখন বাইবেলের দিকে টেনে নিতে চায়, সে তখন আপত্তি করে না, অন্যরা যখন তাকে ইহুদির দিকে ঠেলে দেয়, তখনও তার মুখে কোনও প্রতিবাদ শোনা যায় না। বরং আবেগে সে গান ধরে।

মার্ মান দেব্‌লা মার্ মান
সামো না মুদারা মান
দেব্‌লা তু মেন মুদারিয়া,
মিসতো নাই কে রে সা।

—আঘাত করো আমাকে দেবতা, আমাকে আঘাত করো। শুধু দোহাই তোমার, আঘাত করে একেবারে মেরে ফেলো না আমাকে, তাহলে দেখবে তোমার মাথায় আমার রক্ত!

এ গান বাইবেলের নয়। ওরা বাইবেলের লোক নয়। কেননা, ইউরোপের জিপসী-তাঁবুতে কুড়িয়ে পাওয়া এইসব কাহিনি ভারতে গ্রান্ড রোডের ধারে যে বেদেরা ছাউনি ফেলে বাস করছে, তাদের মুখে শোনা যায় না। কলকাতার চৌরঙ্গী পাড়ায় যে জিপসী মেয়ে মুরগি ফিরি করে বেড়ায়, সেও এসব বিষয়ে কিছু বলতে পারবে না। এমনকি ইউরোপের জিপসী সুন্দরীও যখন শুনতে পায় বাজারের পথে তার হাতে গুঁজে দেওয়া কাগজটিতে লেখা রয়েছে খ্রিষ্টীয় তত্ত্বকথা, তখন নাকি সে মোটেই তা জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে না। পাদ্রী যখন বলেন—বি সেভড্ হোয়াইল দেয়ার ইজ টাইম। দি এন্ড অব দি ওয়ার্ল্ড ইজ কামিং সুন! তখন নাকি সে হাসতে হাসতে লুটোপুটি খায়—ও, তাই নাকি ঋষি? কখন শেষ হবে? এই হপ্তায়ই কি?

ওদের সঙ্গে ইহুদিদেরও কোনও যোগ নেই। অন্তত রক্ত-সম্বন্ধ নেই। বাইবেলের নয়, ইহুদি নয়, ইজিপসিয়ানও নয়। তবে এই লক্ষ লক্ষ মানুষ—কে ওরা?

উত্তরে জিপসীর সেই এক কথা : আমি কালো, আমি সাচ্চা মানুষ,—আমার পিতৃভূমি আছে। আর সব কথা চাপা পড়ে গেল তার প্রাণখোলা হাসির নীচে। যে যা-ই পরিচয় দিতে চান, হাসতে হাসতে সে তাই গ্রহণে রাজি।

বিস্ময়বিমুগ্ধ ইউরোপ ওদের পেয়ে কিছুটা বিমূঢ়ও বটে। তাদের তখন নবাগত এই মানুষের দলকে যাচাই করে নেওয়ার মেজাজ নেই। জিপসী তার কালো চুল আর কালো চোখে মাতিয়ে দিয়েছে ইউরোপের হৃদয়-মন। পশ্চিম যেন মন্ত্রমুগ্ধ। ওদের বন্য চেহারা, ময়ূরের মতো বর্ণাঢ্য পোশাক, স্বাধীন স্বচ্ছন্দ জীবন ইউরোপের মনোরাজ্যে যেন হঠাৎ আবেগের ঝড় তুলেছে সেদিন। সে ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে সব জিজ্ঞাসা। প্যারিসে রাজা এবং রাজসভা সানন্দে গ্রহণ করলেন তাদের। অবশ্য জিপসীর বিচিত্র জীবনধারায় সে-ই একমাত্র অভিজ্ঞতা নয়। দু'হাত বাড়িয়ে এই অভ্যর্থনার মতো, রুক্ষ হাতের নির্মম আঘাতও জুটেছে তার ভাগ্যে। কখনও ফুলের তোড়া, কখনও ঢিল-পাটকেল। সে-কাহিনি পরে। আগে জিপসী-বন্দনার সেই দিনগুলোর কথাই শোনা যাক।

প্যারিস, বলা নিষ্প্রয়োজন, জিপসীর জীবনে প্রথম ইউরোপীয় শহর নয়।

আধুনিক গবেষকদের মতে ইউরোপে সরকারি ভাবে, অর্থাৎ কাগজে-পত্রে তাদের আবির্ভাব :

বোহেমিয়া—১২৬০ কিংবা ১৩৯৯ সনে (?) ক্রিট—১৩২২ সনে, সার্বিয়া—১৩৪৮ সনে, বাল—১৪১৪ সনে, স্যাক্সনি—১৪১৮ সনে, ফ্রান্স—১৪১৯ সনে, ডেনমার্ক—১৪২০ সনে, রোম—১৪২২ সনে, প্যারিস—১৪২৭ সনে, ওয়েলস্—১৪৩০ বা ১৪৪০ সনে, স্পেন—১৪৪৭ সনে, ইংল্যান্ড—১৪৯০ সনে, স্কটল্যান্ড—১৪৯২ সনে, রাশিয়া—১৫০০ সনে, ইংল্যান্ড—১৫০৯ সনে, সুইডেন—১৫১৫ সনে। এবং অন্যান্য অঞ্চলেও প্রায় একই সময়ে। আমেরিকায় পাড়ি জমায় তারা পরে, প্রথমে ইউরোপীয় অভিযাত্রীদের পিছু পিছু, তারপরে আবার নানা দেশ থেকে নানা ভাবে।

জিপসীর নিজের কোনো নাম নেই। নিজেকে অবশ্য সে বলে 'রোম'। অর্থাৎ—মানুষ। কিংবা 'রোম'নিচল' বা মানুষের সন্তান। তার চেয়ে ভালো পরিচয় আর কী হতে পারে? কিন্তু অন্যরা তাতে তৃপ্ত নয়। তারা নিজেদের খুশিমতো নাম ধরে তাকে ডাকে। জিপসীর তাই এক এক দেশে এক এক নাম। ইউরোপে আসার আগে ওরা কোথায় ছিল সে-রহস্য এখনও উদঘাটিত হয়নি। পণ্ডিতদের অনুমান, খ্রিষ্টীয় দশম শতক থেকে পঞ্চদশ শতক কেটেছে ওদের নিকট প্রাচ্যে, পারস্যে, তুরস্কে এবং গ্রিসে। বালুচিস্তান আর ইরাকে ওদের নাম যদি 'লুরি' (Luri); পারস্যে তবে 'কাকরি' (Kakari) এবং 'জাঙ্গি' (Zangi), আফগানিস্তানে 'কাউলি' (Kauli), তুরস্কে এবং সিরিয়ায় 'চিনঘানিজ' (Cingahanes), অথবা 'চিনগানেস' (Tchinganes), গ্রিসে—'কাটসিভেলই' (Katsiveloi), 'সিগানোস' (Tsiganos), এবং 'অ্যাটসিনকানোই' (Atsincanoi)।

ইউরোপের দেশে দেশে তার এক এক নাম। কিছুদিন ওদের চালানো হয়েছিল 'সারাসিন' (Saracens) বলে। কখনও বা বলা হত—'মুর' (Moor) কিংবা টার্টার (Tartar)। বোধহয় মুসলিম হামলার দিনগুলোর স্মৃতি ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল ওরা! এমনকি এক সময় রটে গিয়েছিল 'রোম' শব্দটাও আসলে 'মুর' থেকেই এসেছে। ফরাসি দেশের কোনও কোনও অঞ্চলে ওদের নাম—'কারাকিস (Caraques)। পারস্যে ব্যবহৃত 'কাকরি'র মতো এই শব্দটিও অর্থ নাকি, কারও কারও মতে, মূলত—'কালো'। ষোড়শ শতকের ফ্রান্সে ওদের আর এক নাম—'রাবোঁয়া' (Rabouins)। সে সময় এই অর্থ ছিল নাকি—শয়তান স্বয়ং। ফ্রান্সে জিপসী বোঝাতে আরও কিছু কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা : 'বিউরদিনদি' (Beurdindis), 'কাম্প-ভোলান্ত' (Camp-Volants), 'বোহেমিয়ান' (Bohemians) ইত্যাদি। অবশিষ্ট ইউরোপের

মধ্যে বুলগেরিয়ায় ওদের নাম—'সিগানি' (Tsigani), রুমানিয়ায়—তিগানি (Tigani), হাঙ্গেরিতে—'চিগানোক' (Ciganyok), ইতালিতে—'জিনগারি' (Zingari), জার্মানিতে—'জিগুনের' (Zigeuner), স্পেনে 'জিনকালি' (Zincali), পর্তুগালে—'সিগানোস' (Ciganos), এবং ব্রিটেন ও আমেরিকায়—'জিপসী' (Gypsy)। আর জিপসীর কাছে অন্যদের নাম? তার কাছে দুনিয়ার আর সবাই, অর্থাৎ যারা 'রোম' কিংবা 'রোমানিচল' নয়, তারা হল 'গাজো' (Gadjo), কিংবা 'গাউহো' (Gaujo)—চাষি, ভূমিদাস; অর্থাৎ যারা মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকে, যারা ঘুরতে জানে না। বহুবচনে, অর্থাৎ 'গাজো' যখন দলবদ্ধ তখন 'রোম' বলে—'গাজে' (Gadje)। 'গাজো'র ঘরের মেয়েরা তার কাছে—'গাজি' (Gadji)।

প্যারিসের কথা আগেই বলা হয়েছে। অন্যত্রও প্রথম আবির্ভাবে 'গাজো'রা সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করলেন 'রোম'কে। ফ্রান্সে ওরা ঘোড়া, গাধা কিংবা বলদে টানা গাড়িতে মালপত্র চাপিয়ে ঘুরে বেড়াত। রাত কাটাত তাঁবুতে। চিরাচরিত পেশা ছাড়াও ফ্রান্সে তখন জিপসীর অনেক কাজ। পুরুষেরা নানা দলে ভাড়াটে-সৈন্য হিসাবে নিযুক্ত হচ্ছে, কেউ কেউ সম্পন্নের প্রাসাদে দ্বাররক্ষক। মেয়েরা প্রমোদ উদ্যানে নাচে, অনেকে নদীতে ফেরি পারাপার করে। বলকানে তাদের আরও খাতির। এশিয়া সেখানে অজ্ঞাত পৃথিবী নয়। অটোমান সাম্রাজ্যের দৌলতে এশীয় ভাবধারা রীতিমতো সুপরিচিত। সুতরাং, জিপসী দেখে বিস্ময়ে হতবাক হলেন না কেউ। দিব্যি মেলামেশা চলতে লাগল। যেন স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই নবাগত বিদেশিদের। এ সৌভাগ্য অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অনেক সামন্ত প্রভু ওদের ভূমিদাসে পরিণত করলেন। জিপসীর পক্ষে সে এক নতুন অভিজ্ঞতা সন্দেহ নেই। স্বাধীন স্বচ্ছন্দবিহারী রোম এবার দাস। সাধারণত বলা হয়ে থাকে জিপসী এই এলাকায় দাসে পরিণত হয় সপ্তদশ শতকে। কিন্তু অনেকে মনে করেন ওদের এভাবে চিরকালের মতো বন্দি করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল আরও আগেই। বলকানে জিপসীর সুখের কাল অতএব নাতিদীর্ঘ। হাঙ্গেরি এবং ট্রান্সসিলভানিয়ায়ও দাস-জীবন যাপন করতে হয়েছে ওদের। কিন্তু অন্যভাবে। রাজা রাজকর্মচারীদের নির্দেশ দিতেন জিপসীদের দিয়ে প্রয়োজনমতো রাষ্ট্রীয় কাজ করিয়ে নিতে। যথা : অস্ত্র তৈরি। ওদের সৈন্যদলেও নিযুক্ত করা হত। হাঙ্গেরির রাজা একসময় (১৪৯৩) ওদের ঘুরে বেড়াবার অধিকার মেনে নিয়ে একটি ছাড়পত্রও দিয়েছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল—এই পত্রবাহক এবং তার সঙ্গী জিপসীদের যেন আমার সাম্রাজ্যের সর্বত্র আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়। কী শহর, কী গ্রাম—সর্বত্র যেন তাদের নিরাপদে বাস করতে দেওয়া হয়। এই দলে যদি কোনও

মত্ত স্ত্রীলোক দেখা যায়, কিংবা যদি অশান্তিকর কোনও ঘটনা ঘটে তা হলেও যেন কেউ বিচারের দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে না নেয়। দলে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার অধিকার একমাত্র দলপতির। জিপসীরা নাকি বলত—হাঙ্গেরি-রাজ প্রয়োজন হলে তাদের চুরি করার অধিকার প্রয়োগেরও অনুমতি দিয়েছেন। হাঙ্গেরির রানি মারিয়া টেরেসা তাদের ভবঘুরে জীবনের দুঃখ ঘোচাবার জন্য জিপসীকে স্থায়ী নাগরিকে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। সেটা অবশ্য অনেক পরের কথা। মারিয়া টেরেসা'র পুনর্বাসন প্রকল্প চালু করার চেষ্টা হয়েছিল ১৭৬১ সনে।

জিপসীকে যথেষ্ট খাতির দেখিয়েছেন রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন দি গ্রেটও। রাশিয়ায় জিপসীর আবির্ভাব ১৫০০ সনে। সেখানেও নাকি আইনত তারা সরকারের দাস বলে গণ্য হত। কিন্তু বাস্তবে সে প্রভুত্ব দেখানো হত কদাচিৎ। সম্ভ্রান্ত রুশিরা নির্দ্বিধায় তখন জিপসী মেয়েকে ঘরে তুলে নিতেন পত্নী হিসাবে। জিপসী কারিগরের সামনে সেখানে তখন অফুরন্ত কাজের সুযোগ। ক্রিমিয়া, ইউক্রেন এবং কৃষ্ণসাগরের তীরে জিপসী নাকি তখন মাঠে কাজ করে। জার্মানিতে জিপসী সুবর্ণ-যুগ যাপন করেছে পঞ্চাশ বছর। পঞ্চদশ শতকে জার্মানির মাটিতে পা দেওয়ার পর জার্মানরা সত্যই তীর্থযাত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছিল ওদের। জিপসী দলপতি অতএব কেউ ডিউক, কেউ কাউন্ট, কেউ বা প্রিন্স সেজে দিব্যি সেখানে ঘুরে বেড়ায়।

স্পেনে জিপসীর প্রথম পদসঞ্চার ১৪৪৭ সনে। সেদিন বার্সিলোনায় যারা এসে আবির্ভূত হয়েছিল, তারা ইউরোপে ভ্রাম্যমাণ জিপসীরই একটি গোষ্ঠী। এরা 'রোম' বা 'রোমানিচল'। স্পেনে আর একদল জিপসী রয়েছে। তাদের বলা হয়— 'জিতানোস' (Gitanos)। ওরা এসেছে উত্তর আফ্রিকা থেকে। পোপের ছাড়পত্র বা নির্দেশপত্র কিন্তু প্রথম দলের হাতেই ছিল। 'জিতানোস'দের সঙ্গে এই দলের পার্থক্য অনেক। 'জিতানোস্'-এর মূল ভাষাও ছিল 'রোমানি' বা 'কালো' (Calo)। কিন্তু 'রোম' আর 'জিতানোস'-এর ভাষায় তবু নাকি অনেক ফারাক। তবু পণ্ডিতরা মনে করেন, আদিতে ওরা ছিল একই বৃন্তের দুই ফুল পশ্চিম অভিযানের সময় দুই দলে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, এই যা। একদল বলকানের পথে ইউরোপের দিকে পা বাড়ায়, অন্যদল এগিয়ে চলে ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূল ধরে। সে কারণেই তাদের ভাষা এবং আচারে মিশর ও উত্তর আফ্রিকার নানা চিহ্ন। সে যা হোক, পোপের অনুমতি পত্র তাদের হাতে, সুতরাং সেখানেও তাদের অভ্যর্থনায় কোনও ত্রুটি ঘটল না।

ইউরোপের অন্যান্য দেশেও মোটামুটি একই কাহিনি। ফ্রান্সে ডিউক অব লিটল ইজিপ্টের মতোই ইতালিতে সহৃদয় আশ্রয় লাভ করল মাইকেল অব ইজিপ্ট (১৪২২)। তার সঙ্গে ছিল একশো সহযাত্রী। সমসাময়িক একজন ইতালিয়ান

তাদের আবির্ভাব বর্ণনা করে লিখেছেন—কালো রঙের এই মানুষগুলো যেমনই অসভ্য, তেমনই নোংরা। তাদের মাথাভর্তি কালো চুল। মেয়েরা দীর্ঘকায় এবং স্বাস্থ্যবতী। কিন্তু তাদের কোনও লজ্জাশরম নেই। যুবতীর বুকে একটুকরো জামা। এমনভাবে পরে থাকে যে, শরীরের প্রায় সবটুকুই দেখা যায়। একটি মেয়ে তো প্রথম দিনই একটি পাবলিক স্কোয়ারে প্রকাশ্যে সন্তান প্রসব করল।

বিবরণটির মধ্যে কৌতূহল এবং ঘৃণা দুই-ই ছিল। তবুও জিপসীর প্রতি আকর্ষণকে কিন্তু ঠেকানো গেল না। ১৪৩০ থেকে ১৪৪০ সনের মধ্যে ইংল্যান্ডে এসে নামল ওরা। ওরা মানে লিটল ইজিপ্টের আর এক আর্ল আর তার দলবল। এই দলপতির নাম ছিল জন ফা। দেখতে দেখতে স্কটল্যান্ড, আয়ার্ল্যান্ড, ওয়েলস,—ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র ওরা। স্কটল্যান্ডের রাজা চতুর্থ জেমস সানন্দে বরণ করে নিলেন জন ফা'-কে। জন ফা'-কে নিয়ে জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত তৎকালেরই রচনা। সমসাময়িক স্কটল্যান্ডের আর একটি জনপ্রিয় লোকসংগীত দি র‍্যাগ্‌ল-ট্যাগ্‌ল জিপসীজ-ও! এই গানেও জিপসীর প্রতি 'গার্গিও'দের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের ইঙ্গিত মেলে। গানটি রীতিমতো দীর্ঘ। শুকনো গদ্যে তার কাহিনি :

প্রাসাদের দুয়ারে দাঁড়িয়ে গান গাইছে জিপসী। গলা তার কখনও উঁচু কখনও নিচু। নিজের খাসকামরায় শুয়েছিলেন বাড়ির তরুণী-গৃহিণী। গান শুনে তার হৃদয় গলে গেল, বরফ যেমন উত্তাপে গলে। এমন মিষ্টি আর এমন তীক্ষ্ণ সুর ওদের যে, লেডির চোখ বেয়ে অঝোরে জলের ধারা নেমে এল। তিনি তাঁর গায়ের রেশমি গাউন খুলে ছুড়ে দিলেন। ছুড়ে দিলেন হাতের আংটি। তারপর স্প্যানিশ চামড়ায় তৈরি হাই-হিল জুতো খুলে খালি পায়ে নেমে এলেন পথে। স্বামী এসে খবর শুনে বিমূঢ়। তিনি তক্ষুনি দুধের মতো সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন তার ভালোবাসার বধূকে খুঁজতে। অনেক ঘুরে অবশেষে তার সন্ধান পাওয়া গেল। লর্ড বললেন—কেন—তুমি আপন ঘর, আপন দেশ ত্যাগ করে ওদের সঙ্গে চলেছ? কেন তুমি তোমার সদ্য-বিবাহিত স্বামীকেই বা ত্যাগ করবে? লেডির উত্তর : হোয়াট কেয়ার আই ফর মাই হাউস অ্যান্ড মাই ল্যান্ড? হোয়াট কেয়ার আই ফর মাই ট্রেজার, ও? হোয়াট কেয়ার আই ফর মাই নিউ-ওয়েডেড লর্ড? আই অ্যাম অফ্ উইথ দি র‍্যাগ্‌ল-ট্যাগল জিপসীজ; ও!

সুতরাং, ইউরোপে জিপসীর জীবনে সোনালি-দিন অচিরেই সন্ধ্যায় পৌঁছাল। সৌভাগ্য খুবই ক্ষণস্থায়ী প্রমাণিত হতে চলল। তার পিছনে, বলা নিষ্প্রয়োজন, অনেক কারণ।

জিপসীর দল প্রথম দিনই প্যারিসকে পাগল করে দিল। হাতে চুড়ি, গলায়

মালা, পায়ে মল, মাথায় বেণী! ঘাঘরা-পরা মেয়েরা ঝুলি হাতে বেরিয়ে পড়ল পাড়ায় পাড়ায়। অবাক হয়ে তাদের চলার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে তরুণরা। তাদের মনে হয়—এমন করে তামাম ইউরোপে কেউ হাঁটতে জানে না। কটাক্ষে দু'পাশের নগর-জীবনকে অস্থির করে ওরা এসে হাজির হয় বড় বড় অট্টালিকাগুলোর সামনে। অভিজ্ঞতায় তারা জানে, কোথায় সোনাদানা আছে। আরও জানে, যেখানে যত বেশি ঐশ্বর্য, সেখানেই তত বেশি অতৃপ্তি আর অস্থিরতা। বড়-লেডির ছেলে হয় না, ছোট-বিবি আপন মানুষের মন পায় না। এসব বাড়ির খোপে খোপে আরও কত দুঃখ, কত যন্ত্রণা!

ইতিমধ্যেই দিকে দিকে খবর রটে গেছে। সুতরাং, যেখানে জিপসী মেয়ে সেখানেই ভিড়। কেউ হাত দেখাতে চায়, কেউ ওষুধ চায়, কেউ পূর্ব দেশের দুর্লভ পাথর চায়। কেউ বা আর কিছু নয়, সুদ্ধ নাচ দেখতে চায়। জিপসী মেয়ে নাচতে নাচতে বলে—কালো জাম যত কালো ততই মিষ্টি, তাই না। মরদেরাও বসে নেই। কেউ হাপর খাটিয়ে বসে গেছে, লোহা এবং টিনের কাজ করছে; কেউ ঘোড়ার পায়ে নাল লাগাচ্ছে, কেমন করে তার সেবাযত্ন করতে হয় 'গাজো'কে তা-ই শিখিয়ে দিচ্ছে। ফাঁকে ফাঁকে আপন মনে গান গাইছে :

যদি তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়ে থাক জিপসী,
—তবে ভয় কী?
ওই তো, চাষির খামারে ঘোড়া দেখা যাচ্ছে।
যদি জিপসী শিশুর খিদে পেয়ে থাকে,
—তবে ভয় কী?
ওই তো, গোলাবাড়িটার কাছে মুরগি দেখা যাচ্ছে!
যদি জিপসী জোয়ানদের তৃষ্ণা পেয়ে থাকে,
—তবে ভয় কী?
তাদের জন্য অনেক, অনেক পানীয় আছে।
—অ্যান্ড ইফ্ দেয়ার ইজ নট ইন দি
জিপসী হ্যান্ড
দেয়ার আর ওয়েলদি গার্গিওস
ইন অল দি ল্যান্ড।

সুতরাং, দু'দিন পরেই দেখা গেল ও বাড়ির দুটো মুরগি পাওয়া যাচ্ছে না ও বাড়ির ক'টা আসবাবও যথাস্থানে দেখা যাচ্ছে না। অভিজাত মহিলারা সাক্ষ্য দিলেন—তা বটে, মেয়েটা হাত দেখে যাওয়ার পর থেকেই ব্যাগটা খুঁজে পাচ্ছি

না। ইতালিতে তাদের প্রথম আবির্ভাবের পরে কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে একটি সমসাময়িক বিবরণ আছে। তাতে বলা হয়েছে : অনেকেই সশ্রদ্ধ চিত্তে রওনা হল ডিউক মাইকেলের স্ত্রীর কাছে হাত দেখাতে! তারা সবাই জানলেন ভবিষ্যতে তাদের জীবনে কী ঘটবে। কিন্তু বর্তমানে যা ঘটছে তাও রীতিমতো চাঞ্চল্যকর। কেউ সেখানে যেমনটি গিয়েছিলেন তেমনটি আর ফিরতে পারছেন না। সবাইকে কিছু না কিছু খুইয়ে আসতে হচ্ছে। কারও পয়সার থলিটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কারও অন্য কিছু। জিপসী মেয়েরা সাধারণত পাড়ায় পাড়ায় টহল দিতে বের হয় ছ'টা থেকে আটটার মধ্যে। যেখানে যা তাদের হাতের সামনে পড়ে দেখ-কি-দেখ তা-ই তারা তুলে নেয়। কেউ কেউ জিনিস কিনতে দোকানে ঢোকে। কিন্তু কেনে যৎসামান্য, বা কিছুই না। আসল মতলব হাতসাফাই।

প্যারিসে জিপসীদের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে আর এক সমসাময়িক দর্শক লিখছেন : বোহেমিয়ানরা শহরের ঘরে ঘরে অশান্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে। জিপসী মেয়ের কথা শুনে অনুগত স্ত্রীরা স্বামীর দিকে সন্দেহের চোখে তাকাতে লাগল। সন্দেহপরায়ণ স্বামীরা স্ত্রীর উপর আস্থা হারিয়ে বিবাগী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করে বেড়াচ্ছেন। জিপসীর জড়িবুটির প্রতিশ্রুতি পেয়ে দমিত রিপুরা হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। প্রকৃতির কাছাকাছি থাকে জিপসী। সুতরাং, তার দেওয়া ঔষধকে হেলাফেলা করা ঠিক নয়, কোন্ দ্রব্যের কী গুণ সে অবশ্যই তা জানতে পারে। সে-সব রসায়নের স্পর্শে অতএব দেশে অনাচারের বান ডাকার সম্ভাবনা!

তাছাড়া জিপসী মিস্ত্রিদের কাণ্ডকারখানা দেখে স্থানীয় কারিগরদের মুখ শুকিয়ে এল। ওরা সহজে, এবং নামমাত্র পারিশ্রমিকে এমন চমৎকার চমৎকার কাজ করে ফেলে যে ভাবাই যায় না!

ফলে পোপের পাঞ্জা ধুলোয় গড়াগড়ি গেল। কিছুদিনের মধ্যেই জিপসী মেয়েরা ডাইনি বলে চিহ্নিত হল। পুরুষেরা আখ্যা পেল—চোর। নয়তো—ডাকাত। প্যারিসের আর্চ বিশপ নিজে শহরবাসীকে সতর্ক করে দিলেন—খবরদার, কেউ বোহেমিয়ানদের ধারে কাছে ঘেঁষবে না। সরকারি ভাবে জিপসী শাসন শুরু হল ১৫৩৯ সনে। দেশের পার্লামেন্ট হুকুম দিলেন—বোহেমিয়ানদের দেশ থেকে হঠাও। ১৫৬০ সনে আবার কড়া হুকুম—হয় দেশ ছাড়, না হয় জাহাজের খোলে বোঝাই হয়ে চল দেশান্তরে। ১৬০৭ সনে ফরাসিরাজ চতুর্থ হেনরি জিপসী ধরা এবং তাড়ানোর কাজে মন দিলেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তিনি এটাও জানিয়ে দিলেন যে, জিপসী নাচনেওয়ালীদের সম্পর্কে তাঁর কোনও আপত্তি নেই, ইচ্ছা করলে তারা এদেশে থেকে যেতে পারে। রাজার আদেশে কিছু জিপসী নর্তকীকে হাজির করা হয়েছিল প্রাসাদে। কিন্তু তিনি নাকি বলেন—ওদের শরীর থেকে কেমন যেন উগ্র গন্ধ বের হয়, সহ্য করা কষ্টকর।

ত্রয়োদশ লুইয়ের কাছে জিপসী যেন আরও অসহ্য। তিনি ফতোয়া দিলেন—দু'ঘণ্টার মধ্যে বোহেমিয়ানদের প্যারিস ছেড়ে যেতে হবে। দু'মাসের মধ্যে আমার রাজত্বের চৌহদ্দি। তাতে খুব কাজ হয়েছিল বলে মনে হয় না। কেননা, চতুর্দশ লুইয়ের আমলেও হুংকার—সময় দেওয়া গেল একমাস। ১৬৮২ সনে সম্রাট নবউদ্যমে জিপসী শাসনে মনোযোগী হলেন। রাজকীয় ঘোষণায় পরিষ্কার বলে দেওয়া হল—সরকার জানেন বোহেমিয়ানদের অনেক পৃষ্ঠপোষক রয়েছে। এদেশে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের নানা ভাবে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। এই অনাচার আর বরদাস্ত করা হবে না। জিপসী জোয়ানদের অবিলম্বে কয়েদ কর, মেয়েদের ধরে মাথা মুড়িয়ে দাও। রাজসরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হল—জিপসী ধরে দিতে পারলে নগদ পুরস্কার মিলবে। সুতরাং, শুরু হল জিপসী নিগ্রহ। পঞ্চদশ লুইও একই স্টাইলে চাপিয়ে গেলেন কঠোর শাসন। তাঁর রাজত্বকালও জিপসীর রক্তে লাল। ফ্রান্সে তখন জিপসী মেয়ের ফাঁসি হচ্ছে, জিপসী মেয়ে আগুনে পুড়ছে। কেননা, ওরা ডাইনি।

অভিযোগ উঠল—দুইজন জিপসী আর একটি জিপসী মেয়ে মিলে জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলাকে এমন একটি রসায়ন তৈরি করতে শিখিয়েছে, যা পান করলে মৃত্যুর সঠিক চেহারাটা চাক্ষুষ করা যায়। অথচ সে আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় না মরেই! খবর শুনে দেশ আতঙ্কিত। বিচারে রায় দেওয়া হল—ওরা শয়তানের অনুচর, ওদের পুড়িয়ে মারো। তা-ই করা হল।

আর একবার অভিযোগ শোনা গেল—একটি ফরাসি মেয়ে এক জিপসী বুড়িকে ডেকে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করেছে—আচ্ছা, বলতে পার, আমার বাবা কবে মারা যাবে? ব্যস, তাই শুনে বিচার সভা বসে গেল। বুড়ির সঙ্গে সাজা হল পিতৃদ্রোহী তরুণীরও। অবশ্য দু'জনের এক সাজা নয়।

জিপসী মেয়ের-ফাঁসিদৃশ্য বর্ণনা করেছেন তৎকালের এক লেখক : প্রকাশ্য রাস্তায় ফাঁসি হচ্ছে জিপসী তরুণীর। চারিদিকে প্রচণ্ড ভিড়। দেখা গেল একটা আলখাল্লা মতো পোশাক গায়ে মেয়েটি এগিয়ে যাচ্ছে ফাঁসিকাঠের দিকে। ওর হাঁটু দুটি দড়িতে বাঁধা হল। তারপর বেঁধে ফেলা হল হাত। তারপর—। ওকে পোশাক পরিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে নাকি তার বিশেষ অনুরোধে। ওদের দেশে মেয়েদের নাকি তা-ই করা হয়। বিবরণ উদ্ধৃত করে একালের লেখকের মন্তব্য—তাও ভালো। জোন অব আর্ককে কিন্তু আগুনে দেওয়া হয়েছিল পুরোপুরি বিবস্ত্র অবস্থায়। শালীনতা সম্পর্কে জিপসী মেয়ের ধারণাকে যে ওরা সম্মান জানাতে পেরেছিল এটা অবশ্যই সামান্য কথা নয়।

আর একবার ওই ফ্রান্সেই অভিযোগ শোনা গেল—এই জিপসী মেয়ে শহরের এক কসাইকে ঠকিয়ে গেছে। মেয়েটি তার কাছে একটা ভেড়া নিয়ে গিয়ে বলে—কিনবে? দোকানি রাজি হল। কিন্তু জিপসী মেয়ে কিছুতেই একশো মুদ্রার কমে ভেড়া হাতছাড়া করবে না। ফলে দোকানি বেচারা ভেড়ার আশা ছেড়ে দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথ ধরল। কিছু দূর যেতে না-যেতেই সামনে আবার সেই জিপসী মেয়ে। মেয়েটি বলল—বেশ, যা বলছিলে তাই দাও।—থলিটা বয়ে বয়ে আমি আর পারছি না। দোকানি পয়সা গুনে দিয়ে বাড়ি চলল। ভেড়াটা সে আগেই দেখে নিয়েছে।—কিন্তু এ কী! বাড়ি পৌঁছে থলিটি নামানো মাত্র তার থেকে বেরিয়ে এল একটি ফুটফুটে জিপসী ছেলে। আর থলি থেকে বেরিয়েই তার সে কী দৌড়!

এমনি সব অদ্ভুত গল্প। একবার রটে গেল—এক জিপসী শুয়োর বিক্রি করছিল। কিন্তু খদ্দেররা বাড়ি নিয়ে গিয়ে দেখে সেগুলো সব খড়ের জুতো।

একথা সত্য, জিপসী সুযোগ পেলেই 'গোর্গিওদের ফাঁকিতে ফেলে। যারা জিপসী নয়, তাদের ফাঁকি দিতে তাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। বরং তা নিয়ে

নিজেদের মধ্যে তারা রসিকতা করে। হাল আমলেও জিপসী নাকি যখন-তখন অন্যদের প্রতারণা করে। একজন লেখক লিখেছেন : কয়েকটি মেয়ে দোকানে গিয়ে মাংস কিনল। বেশ পছন্দসই মাংস। অনেক দাম। দেখে আমি ভাবছি, এত পয়সা আছে ওদের? মাংস একটা পাত্রে রাখা হল। দোকানির বউ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েদের দিকে। বোধহয় সে হাত সাফাইয়ে জিপসীদের দক্ষতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। পয়সা দিতে গিয়ে একটি মেয়ে বলল—এই যা, টাকার থলিটা তো আনতে ভুলে গেছি। আচ্ছা, এই রইল তোমার মাংস, আমি এক ছুটে পয়সা নিয়ে আসছি। অন্যরাও তার পিছু পিছু ছুটল। কিন্তু তারা আর ফেরে না। দোকানির বউ বিরক্ত হয়ে বলল—নাও, এবার মাংসটা তুলে রাখ। দোকানি পাত্রের ঢাকনা খুলে দেখে তার তলা নেই। সে একদিকে যখন মাংস ওজন করে দিয়েছে, অন্যদিকে মাংস চালান হয়ে গেছে ঠিক অন্য কোনও থলিতে।

আর একবার জিপসীদের দলের সঙ্গে লেখক সরকারি অফিসে গেছেন। একজনের ছেলে হয়েছে, খাতায় সেটা লেখাতে হবে। অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন—মা কে? সঙ্গে একটি বয়স্কা জিপসী মেয়ে ছিল। তাকে দেখিয়ে দেওয়া হল। ওই মেয়েটিকে বৃদ্ধা বলে গণ্য করাই সঙ্গত। অফিসারটি একটু সন্দেহের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। মেয়েটিও বলল—সে-ই মা। অগত্যা মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায় কী! বেরিয়ে এসে লেখক দলপতিকে বললেন—মিছিমিছি মিথ্যে বললে কেন? সে হেসে উত্তর দিল—আরে, এতে কিছু হয় না। 'গোর্গিও'দের কাছে মিথ্যে বললে দোষ হয় না। তাছাড়া, সত্য বললে কত ঝামেলা হতো বুঝতে পারছ! যে মেয়েটির সত্যিই ছেলে হয়েছে তার বয়স কত হবে,—তেরো! গোর্গিওদের আইনে আমাদের নির্ঘাত সাজা হয়ে যেত। ভদ্রলোক লিখেছেন, এ-কারণেই জিপসীরা সমূহ সংকট এড়াবার জন্য যা খুশি তাই করে। ভাই-বোন, বাবা-মেয়ে পর্যন্ত নিজেদের স্বামী স্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করতে ইতস্তত করে না। খবরের কাগজে জিপসীদের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে যে অনাচারের অভিযোগ শোনা যায়, সে সব কারণেই। সভ্য পাঠক যখন সেসব খবর পড়ে শিহরিত, জিপসী তখন নিঃশব্দে হাসে।

সার্ভেন্টিস-এর গল্পের (লা জিতামিল্লা) নায়িকা জিপসী মেয়ে প্রিসিওসা তাই গর্ব করে স্প্যানিস তরুণকে বলে—তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনও তুলনা হয় না। আমরা পুরোপুরি আলাদা। আমাদের বয়স যাই হোক, বোধ এবং অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। আমরা অপরিচিত এক দেশ থেকে অপরিচিত আর এক দেশে অনায়াসে চলে যাই, আকাশের তারা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে অভিযান তোমাদের সাধ্যের বাইরে। তোমরা কখনও আমাদের

দলে কোনও বোকা জিপসী মেয়ে বা বোকা জিপসী ছেলে খুঁজে পাবে না। সত্যি বলতে কী, বারো বছরের জিপসী মেয়ে যা জানে, তার যা অভিজ্ঞতা, একজন বৃদ্ধা স্প্যানিশ লেডির তা নেই। সুতরাং, মাঝে মধ্যে তোমরা ঠকবে বইকি!

কিন্তু নিজেদের নির্বুদ্ধিতা স্বীকার করে কে! প্রতারিত হয়ে নির্বোধেরা রব তুলল—ওরা ডাইনি। ফলে, শুধু ফ্রান্সে নয়, জিপসী নিগ্রহের ঢেউ বয়ে গেল কমবেশি ইউরোপের সর্বত্র। সেদিক থেকে জিপসীরা ইহুদিদের মতোই বিশ্বের এক অন্যতম অত্যাচারিত সম্প্রদায়। ওরা অবশ্য বলে—অত্যাচার আমাদের সম্মান-তিলক। তাদের কথায়, উপকথায়, আর গানে সে-কারণেই হয়তো যন্ত্রণার চিহ্ন অনুপাতে কম, কিন্তু ইতিহাসের পাতায় রক্তের দাগ এখনও বড় উজ্জ্বল। একালেও জিপসীর অনেক রক্ত ঝরেছে ইউরোপের মাটিতে। হিটলার কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ জিপসীকে হত্যা করেছে তথাকথিত আর্য রক্ত কলঙ্কহীন করার হাস্যকর বাসনায়। এখনও ইউরোপের অনেক দেশে জিপসীর পায়ে পায়ে ফেরে পুলিস। জিপসী তাই গান গায় :

লোকেরা আমাকে খেয়ে ফেললো,
আমাকে গিলে খেলো;
লোকেরা আমাকে ছুড়ে দিচ্ছে সেখানে
যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় না।

শেষ ছত্রটিতে জিপসী স্পষ্টতই জেলখানার কথা বলছে। হিটলারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জিপসীর মনের বেদনা ফুটে উঠেছে আর একটি গানে। হিটলারের বাহিনী তখন ইউরোপের দখলীকৃত এলাকা থেকে জিপসী ধরে ধরে চালান দিচ্ছে বিভিন্ন বন্দি শিবিরে। প্রায় দুই হাজার শিবির গড়ে তোলা হয়েছিল ইহুদি আর জিপসীর জন্য। সেখান থেকে ওদের পাঠানো হত গ্যাস-চেম্বারে—নাৎসি জার্মানির অন্যতম অবদান, অত্যাধুনিক মৃত্যুশালায়। মনের খেদে জিপসী তখন গাইছে :

এক সময় এই বেকস্কায় জিপসীরা বাস করত
বিদেশিরা পথে পথে তাদের মেরে গেল।
জাঙ্কো, দেখো, তোমার তরুণী বউ আর বাচ্চাদের
কী হাল হয়েছে
এ-দুঃখের বোঝা আমি যে আর বইতে পারি না!···
হে হিটলার, তুমি তোমার মাথা হারাবে।
হায়, এ কী করলে তুমি আমাদের দেশকে!
হে হিটলার, তোমার দরজা খুলে দাও,

আমি আমার পরিবারকে দেখতে চাই।
আমার পালকের বিছানা তুমি আমাকে ফিরিয়ে দাও,
আমার বাচ্চারা যে ঠান্ডায় জমে গেল।...

এসব একালের ইতিহাস। পুরনো দিনের ইতিহাস সমান ভয়াবহ। ফ্রান্সের কথা বলা হয়েছে। ১৭৮৯ সনের ফরাসি বিপ্লবও জিপসীকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পারেনি। বরং, দেশে আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার বাসনায় জিপসীকে সেদিন ফ্রান্স থেকে উপনিবেশগুলোতে নির্বাসিত করাই যুক্তিযুক্ত বলে স্থির হয়। ১৮০২ সনে নিশ্ছিদ্র জাল ফেলে জিপসীদের বন্দরে বন্দরে জমা করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্য। কিন্তু যুদ্ধের জন্য পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায়। জিপসীরা তখনকার মতো রক্ষা পায়।

এককালে জার্মানি আর বোহেমিয়ার পথেই পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে হানা দেয় তথাকথিত লিটল ইজিপ্টের আগন্তুকরা। পরবর্তীকালে সে পথও রক্তিম। জার্মানি ১৪৯৮ সনেই জিপসীর হাত থেকে মুক্তির চেষ্টায় ব্যস্ত। ১৫০০ সনে সেখানকার শাসকবর্গ ঘোষণা করেন—এবার থেকে সব ছাড়পত্র, অনুরোধ লিপি ইত্যাদি বাতিল, তা সেগুলো জিপসীরা যেখান থেকেই সংগ্রহ করে থাকুক না কেন। এদেশের মাটির উপর দিয়ে চলাচল জিপসীর পক্ষে অতঃপর নিষিদ্ধ। বহুকাল পরে, ১৭১১ সনে আবার প্রবর্তিত হয়েছিল কড়াকড়ি আইন। তার মর্ম : এই আইন চালু হওয়ার আট দিন পরেও যদি কোথাও কোনও জিপসীকে দেখা যায়, তবে তাকে তৎক্ষণাৎ গুলি করে হত্যা করা হবে। মেয়েদের এবং শিশুদের নিক্ষেপ করা হবে কারাগারে। শুধু কি তাই? সেদিনের প্রুশিয়ায় জিপসী নিক্ষিপ্ত হচ্ছে নদীর জলেও। নারী পুরুষ নির্বিশেষে তাদের ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে ফাঁসিকাঠে। জিপসী লিখতে পড়তে জানে না। ওরা বলে—নিজেদের ইতিহাসের মতো লেখাপড়ার সাজসরঞ্জামও সব সেই কোন্ কালে হারিয়ে গেছে পথে। দেশের সীমান্তে তা-ই তাদের উদ্দেশ্যে সচিত্র সতর্কবাণী : ফাঁসি মঞ্চ। তাতে জিপসী ঝুলছে। আর এক পাশে পড়ে আছে জিপসী নারী পুরুষের স্তূপীকৃত মৃতদেহ!

হাঙ্গেরিতে জিপসীর বিরুদ্ধে নানা চাঞ্চল্যকর অভিযোগ শোনা গেল। ওরা জবরদস্তি করে ভদ্রমেয়েদের ইজ্জত নাশ করছে, ওরা শিশু চুরি করছে, ওরা—নরখাদক। বোহেমিয়ার চুরি বা প্রতারণার অভিযোগ প্রথমে জিপসীর বাঁ কান কাটা যেত, দ্বিতীয়বার নালিশ উঠলে—ডান কান, তৃতীয় বারে কাটা পড়ত—মাথা। ১৭৮২ সনে হাঙ্গেরিতে একচল্লিশজন মেয়ে এবং পুরুষকে ফাঁসি দেওয়া হয় নরমাংস খাওয়ার অপরাধে।—ওরা নাকি পঁয়তাল্লিশ জন মানুষকে খেয়ে ফেলেছে। বলা নিষ্প্রয়োজন,

এসব ক্ষেত্রে তৎকালে অভিযোগ প্রমাণের প্রশ্ন উঠত না। হাঙ্গেরির সৈন্যরা জিপসীদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল দেশের প্রান্তে বিস্তীর্ণ জলাভূমির দিকে। অসংখ্য জিপসী মারা গেল জলে ডুবে। কুড়ি বছর পরে মারিয়া টেরেসার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে, অর্থাৎ জিপসীদের দেশের মাটিতে রোপণ করার নামেও চরম অত্যাচার করা হয়েছে তাদের উপর। তারপরে দ্বিতীয় জোসেফের আমলেও একদিনে পঁয়তাল্লিশ জন জিপসী প্রাণ দেয় ফাঁসিকাঠে। সেবারও অভিযোগ—ওরা মানুষের মাংস খেয়েছে। পরে জোসেফ নিজেই নাকি প্রমাণ করেছিলেন—বিচারে বিভ্রাট ঘটে গেছে। ওরা আসলে নির্দোষ ছিল।

স্পেন, ইংল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক—সর্বত্র জিপসী শাসন তখন অন্যতম পবিত্র রাজকীয় কর্তব্য বলে বিবেচিত। স্পেনের শাসকরা প্রথম থেকেই জিপসীদের উপর খড়্গহস্ত। ১৪৯৯ সনে নির্দেশ প্রচারিত হল—যাদের কোনও স্থায়ী ঠিকানা কিংবা পেশা নেই তাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। ১৫২৮ সনে জিপসীদের সামনে দুটো বিকল্প রাখা হল। হয় দেশ ছাড়, না হয় জাহাজের খোলে বোঝাই হয় বিদেশে চল। মাল টানা, আর দাঁড় টানা কাজ তোমাদের। ফার্ডিন্যান্ড, পঞ্চম চার্লস, আর দ্বিতীয় ফিলিপের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জিপসীরা সেদিন পৃথিবীর দূর দূর দেশ আশ্রয় খুঁজেছে। দ্বিতীয় ফিলিপ তাদের ভবঘুরে জীবনের অবসান ঘটানোর জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন। তিনি এখানে-ওখানে জিতানোস-উপনিবেশ গড়ে তুলতে চাইলেন। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে নতুন করে আবার এই উদ্যোগ শুরু হল। উপনিবেশ থেকে যারা পলাতক হল সে সব জিপসীদের ধরে এনে তাদের মুখ থেকে কল্পিত সব অভিযোগ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি আদায় করা হতে লাগল। অনেকে দণ্ডিত হল মৃত্যুদণ্ডে। ১৬৩৩ সনে চতুর্থ ফিলিপ হুকুম দিলেন—এদেশে থাকতে হলে জিপসীকে আর নিজেদের পোশাক পরা চলবে না, নিজেদের ভাষায় কথা বলা চলবে না। এবার থেকে স্পেনের অন্যান্য বাসিন্দাদের মতো ওদের একসঙ্গে গ্রামে বা শহরে স্থায়ীভাবে বাস করতে হবে। ১৬৯২ সনে নিয়ম হয়ে গেল—জিপসী ঘোড়া বা গাধা রাখতে পারবে না, তার পক্ষে মিস্ত্রির কাজও নিষিদ্ধ। এই মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়া উপলক্ষে সহানুভূতিশীল দর্শকের মুখে বেদনার সংগীত :

…একদিন আমি রান্নাঘরের কাছে
কথা বলছিলাম জিপসী রোসার সঙ্গে।
সে কানে কানে চুপিসারে বলল—
দোহাই, রোমানিতে কথা বলো না।
কেননা, ওখানে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ
ওরা কানে শোনে, চোখেও দেখে।…

ইংল্যান্ডে জিপসী নিগ্রহের শুরু ১৫৩০ সনে। তার প্রায় একশো বছর আগেও জিপসীদের সম্পর্কে জনসাধারণকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু হাতেনাতে জিপসী দমন শুরু হয় অষ্টম হেনরির আমলে। তিনি আদেশ দিলেন—জিপসীরা এদেশে আসতে পারবে না। যারা ইতিমধ্যেই এসে গেছে, ষোলো দিনের মধ্যে দেশত্যাগ করতে হবে তাদের। যদি কেউ এ আদেশ অমান্য করে, তবে তাদের বিষয়-আশয় সব কেড়ে নেওয়া হবে। দ্বিতীয়বার ধরা পড়লে তাদের ডান কানের উপরের অংশটুকু কেটে রেখে দেওয়া হবে। তৃতীয়বার কোনও অপরাধ করলে শাস্তি হবে—মৃত্যু। ১৫৩৭ সনে সরকার জানালেন, জিপসীদের যে করে হোক দেশ থেকে বিদায় করতে হবে। যদি দরকার হয়, মৃত্যুদণ্ডে তাদের উচ্ছেদ করতে হবে! ১৫৫৫ সনে ফিলিপ আর মেরির আমলে আবার নতুন আদেশ : জিপসীদের কুড়ি দিনের মধ্যে এদেশ ত্যাগ করতে হবে। তারপরও একুশ দিনের মাথায় যদি কোনও জিপসীকে দেখা যায়, তবে তার কাছ থেকে চল্লিশ পাউন্ড জরিমানা আদায় করা হবে। একমাস পরে কেউ ধরা পড়লে জরিমানা দিতে হবে প্রাণ। ১৫৬২ সনে রানি প্রথম এলিজাবেথ আবার সে আইন প্রয়োগে ব্রতী হলেন। দেশত্যাগের সময়সীমা অবশ্য তিনি একটু বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, কুড়ি দিন নয়, জিপসীকে দেশ ছাড়তে হবে তিন মাসের মধ্যে। না ছাড়লে বহাল রইল মৃত্যুদণ্ডের বিধান। এলিজাবেথ জিপসীদের বিরুদ্ধে এক অদ্ভুত অভিযোগ তুলেছিলেন। তিনি নাকি বলেছিলেন—জিপসীরা খ্রিস্টান যাজক এবং রোমের দূতদের লুকিয়ে রেখেছে। অবশ্য সেকালে এজাতীয় অভিযোগ আদৌ অভাবিত নয়। কিছুকাল আগে (১৯৬৫ সনে)সম্পূর্ণ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্রিটেনে হঠাৎ অভিযোগ উঠেছিল, জিপসীরা রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। রানি লিডস্ থেকে ফেরার সময় ইয়র্কের কাছে তারা ওত পেতে থাকবে।

স্কটল্যান্ডে প্রথম দিকে জিপসীরা অনুকূল হাওয়াতেই দিব্যি ভেসে চলছিল। দেশের রাজা তাদের স্বপক্ষে ছিলেন। প্রজারাও নবাগত এই বিদেশিদের অপছন্দ করত এমন কোনও প্রমাণ নেই। বরং সরকারি কাগজপত্র বলে, শুধু রাজা চতুর্থ জেমস আর রানি মেরিই নন, স্কটল্যান্ডে জিপসীর বে-সরকারি পৃষ্ঠপোষকও অনেক ছিলেন। ১৫৪০ সনে জনৈক স্কট কিংবা ইংরাজ নাকি ছিলেন জিপসীদের স্থানীয় নায়ক। কিন্তু ক'বছরের মধ্যে ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো স্কটল্যান্ডেও শুরু হয়ে গেল জিপসীবিরোধী আইন রচনার পালা। ১৫৭৩ সনে সেখানে আইন-বলে হাত দেখা, ভাগ্যগণনা নিষিদ্ধ করা হল। তারপর ক্রমে আরও নানা বাধা-নিষেধ।

জিপসীর জন্য ইউরোপের সর্বত্র তখন কমবেশি একই ব্যবস্থাপত্র। কেননা,

জিপসীরা জাদুকর, জিপসীরা—দস্যু, তস্কর। জিপসী মেয়েরা—ডাইনি। তারা নানা শক্তি ধরে। তাদের গান শুনে ঘরের মানুষ ঘর ভুলে যায়, তাদের চোখের জাদুতে সংসারী সংসার ভুলে ভিখারির বেশে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। তাছাড়া জিপসীরা গুপ্তচর। ওরা—বিদেশি, ওরা—বিদ্রোহী, শান্তি এবং স্থিতির শত্রু। যতসব ভবঘুরে আর সমাজবিরোধীদের সঙ্গেই ওদের যত মিতালি।

শেষোক্ত অভিযোগটি বোধহয় পুরোপুরি মিথ্যা নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ফরাসি দেশের কথা বলা চলে। জিপসীরা যখন সেখানে এসে পৌঁছেছে, তখন দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা ভবঘুরের দল। শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে দেশ তছনছ হয়ে গেছে। সমাজব্যবস্থা বিপর্যস্থ। তার উপর মহামারী, ভয়াবহ প্লেগ। দেশ ভিখারি আর গরিবে ভরা। যূথবদ্ধ হয়ে তারা গ্রামাঞ্চল লন্ডভন্ড করে বেড়াচ্ছে। কেননা, তাদের সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই। হয় কেড়ে খেতে হবে, না হয় অন্যের খাদ্য হতে হবে—এই সেদিনকার পরিস্থিতি। বেপরোয়া হয়ে অতএব তারা গড়ে তুলল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ভিখারি আর ভবঘুরের সাম্রাজ্য (১৩৫৬—১৪৫২)। সে রাজ্যে রাজা ভিখারি, মন্ত্রী ভিখারি দেশের শাসন চলে ভিখারির আইন মাফিক। ১৪৫৩ সনে তাদের দৌরাত্ম্যে বার্গান্ডি প্রায় শ্মশানে পরিণত। এমন সময়ে অপরিচিত ভবঘুরে এসে যদি দরজায় কড়া নাড়ে, তবে সেটা ভয়ের ব্যাপার বইকি! কে বলবে, স্বদেশের ভবঘুরেদের সঙ্গে বিদেশের এই ভাগ্যান্বেষীদের কোনও যোগাযোগ নেই!

বস্তুত, তা ছিল না। জিপসী সাধারণত রাজনৈতিক ব্যাপার থেকে দূরে থাকে। স্থানীয় কোনও ব্যাপারে তার আগ্রহ নেই, কারণ, তার স্থায়ী কোনও দেশ নেই। একালের একজন জিপসী-লেখক লিখেছেন—জিপসী হল দলপতির কাছে প্রধান ভাবনা আজ। ভূমিকম্প, বন্যা, রাষ্ট্রবিপ্লব—কোনও কিছুই তাকে সে-চিন্তা থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। সে শুধু নিজের কথা আর দলের কথা ভাবে, ভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে যে দিনটি তার কথা। তবু ইউরোপীয় ইতিহাস চর্চা করলে দেখা যায়, দরকার হলে জিপসী স্থানীয় গরিব এবং অত্যাচারিতের পাশে দাঁড়াতে ইতস্তত করে না! একই জীবনভঙ্গি তাকে ওদের কাছাকাছি টেনে নেয়। জিপসী যথাসাধ্য তাদের সাহায্য করে। ফ্রান্সে সে যেমন ভবঘুরেদের সঙ্গী ও সমর্থক, তেমনই পূর্ব ইউরোপের নানা স্থানে সে আবার বিদ্রোহী কৃষকদের পাশে সহযোদ্ধা।

এই সহমর্মিতার প্রমাণ পাওয়া গেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও। ক্রুদ্ধ, আগ্নেয় দিনগুলোতে ইউরোপের স্থানীয় জনসাধারণ যখন চারদিকে পালাচ্ছে, তখন বাধ্য হয়ে তাদের সঙ্গে সঙ্গে পালাচ্ছে জিপসীর দলও! কেননা, তাছাড়া

অন্য উপায় নেই। কিন্তু এই দুই দল পলাতকের মধ্যে অনেক ফারাক। গাজোরা যখন বিভ্রান্ত, বিমূঢ়, পথশ্রমে ক্লান্ত, জিপসী তখন চারদিকে আগুনের মধ্যেই সহজ, স্বাভাবিক পথিক। তাকে দেখে বোঝা-যায় না সে পলাতক, কিংবা সে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে চলেছে। কেননা, এসবে তার অনেক দিনের অভ্যাস। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধই জিপসীর জীবনে একমাত্র সংকটকাল নয়। সমান অথবা এর চেয়ে ভয়াবহ অবস্থার মুখোমুখিও তাকে হতে হয়েছে যুগে যুগে।

কিছুদিন পরে দেখা গেল জিপসী পরিবর্তিত অবস্থায় দিব্যি নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। তারা মিত্রপক্ষের বৈমানিকদের আশ্রয় দিচ্ছে। পলাতক বন্দিদের এবং দেশপ্রেমিকের নিরাপদ এলাকায় হাত ধরে নিয়ে পৌঁছে দিচ্ছে। স্থানীয় প্রতিরোধ বাহিনীর পক্ষেও তারা বিশেষ সহায়। হিটলার যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল তাদের বিরুদ্ধেও। কিন্তু ইহুদিদের ধরা যত সহজ, জিপসী ধরা তত সহজ নয়। তা হলে ইউরোপ থেকে অনেক আগেই লুপ্ত হয়ে যেত ওরা। জিপসী তখন জার্মানদের চোখে ধুলো দিয়ে রেশন কার্ডের চোরাকারবার করে। বাড়তি খাদ্য গোপনে ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামীদের সরবরাহ করে। জাল পাসপোর্ট তৈরিতেও তাদের অনেক দিনের অভিজ্ঞতা। কত রকমের পাসপোর্ট যে ব্যবহার করেছে ওরা তার ইয়ত্তা নেই। এবার সে-বিদ্যাও কাজে লেগে গেল। শুধু তাই নয়, ইতিহাস বলে, জিপসী সেদিন নিঃশব্দে প্রাণ দিতে রাজি হয়নি। যখনই সুযোগ মিলেছে তখনি সে শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে।

একালে যদি জিপসীর পক্ষে তা সম্ভব হয়ে থাকে, তবে সে-কালেই কি তা অসম্ভব ছিল? জিপসীর পক্ষে গরিব এবং অত্যাচারিতের সঙ্গে সহমর্মিতা স্বাভাবিক। স্বাভাবিক অতএব অন্য পক্ষের অভিযোগও। জিপসী—শান্তির শত্রু আইনের শত্রু, তাকে বিশ্বাস নেই!

জিপসী কিন্তু শতকের পর শতক ব্যাপী এই অত্যাচারেও একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল না। কেননা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইউরোপের ভয়ার্ত চোখে জিপসী যেমন ডাইনি, অমঙ্গলের বার্তাবহ, তেমনি এই জিপসীই আবার তরুণতর ইউরোপীয়ের ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, একঘেয়েমিতে পীড়িত চোখে স্বপ্নলোকের পরি যেন। একজন গবেষক দেখিয়েছেন, বৃদ্ধা জিপসীর মাথাভরা দীর্ঘ পাকা চুল, মুখভরা রেখার আঁকিবুঁকি, রহস্যময় ঘোলা দুটি চোখে যেমন ইউরোপীয় ডাইনি-ধারণার সমর্থন খুঁজে পেয়েছে, তেমনই এই ধারণাকে আরও জোরদার করেছে জিপসীর নানা পেশা ও আচার। ওরা ঘোড়া, কুকুর, ছাগল, ভালুক ইত্যাদি পোযে। কোনও কোনও জন্তুকে দিয়ে অবিশ্বাস্য খেলাও দেখায়। শয়তানের অনুচর ছাড়া আর কার পক্ষে সেটা সম্ভব? ওরা হাত দেখে, রকমারি ঔষধপত্র বিলি করে, এসব বিদ্যাও কি সন্দেহজনক নয়? মার্গারেট মারি বলেছেন—ঠিক তেমনি নির্জন বনপথে চলতে চলতে হঠাৎ দেখা অচেনা চেহারার রূপসী মেয়েরাই আবার প্রশ্রয় দিয়েছে ইউরোপীয় পরির ধ্যানকে। জিপসীর বাহারী পোশাক, খোলা চুল, আর উজ্জ্বল আভরণ অবশ্যই সেদিন তাকে ঠেলে দিয়েছিল পরিদের কুলে। সে পরি না মানবী—সেটা যাচাই করার সুযোগ পায় না নিঃসঙ্গ পথিক। ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে আসামাত্র জিপসী তরুণী ঝোপের আড়ালে উধাও!

ওরা পরি, মনে মনে স্বীকার করেছিলেন সুরসিক রাজন্যবর্গ। এবং অভিজাতরা। তা না হলে জিপসী নিশ্চয় প্রবল অত্যাচারের মধ্যেও বেঁচে থাকতে পারত না সেদিন। অষ্টম হেনরি জিপসী উচ্ছেদের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করেছিলেন, একথা আগেই বলা হয়েছে। ইতিহাস বলে, তিনিই আবার ক্যান্টারবেরিতে অবসর কাটাতে গিয়ে দরবারে ডেকে এনেছিলেন জিপসী মেয়েদের। সেদিন ইংলন্ডেশ্বরের শিবির যেন পূর্বদেশের কোনও শৌখিন সুলতানের প্রাসাদ। সুবেশা জিপসী মেয়েরা বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি সহকারে নেচে চলেছে, বিদেশি রাজা থেকে থেকে নিজের পরিচয় ভুলে যাচ্ছেন যেন। তিনি তখন দেশের আইনের ঊর্ধ্বে এক স্বপ্নলোক। সেখানে সুদর্শনা পরি ছাড়া আর কেউ নেই।

ফরাসি সম্রাট চতুর্দশ লুই আরও বেপরোয়া আইনভঙ্গকারী। তিনিও জিপসী-বিরোধী নানা নিষ্ঠুর আইনের রচয়িতা। কিন্তু বিলাসী লুই তাঁর জীবনের বিরস সন্ধ্যাগুলোতে নিজেই নাকি প্রাসাদে ডেকে পাঠাতেন গায়ক আর নর্তকীদের। লুইয়ের জীবনে সেইসব সন্ধ্যা নাকি বড়ই উদ্দাম, মধুর। শেষ পর্যন্ত লুই জিপসীদের প্রতি এমনি আসক্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, মলিয়ের যখন (১৬৬৪ সন) তাঁর জিপসী বিষয়ক প্রথম নাটক প্রকাশ করেন, স্বয়ং সম্রাট তখন এগিয়ে আসেন জিপসী মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে। জিপসী যুবতীর সাজে সজ্জিত লুইয়ের অঙ্গভঙ্গি আর কটাক্ষ দেখে দর্শকেরা একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন—হ্যাঁ, সম্রাট বোহেমিয়ানদের সঙ্গে সুপরিচিত বটে।

বিস্তর হাততালি কুড়িয়েছিলেন সেদিন তরুণ চতুর্দশ লুই তাঁর অভিজাত দর্শকদের কাছ থেকে। সেদিন যে তাঁরা শুধু লুইয়ের অভিনয় নৈপুণ্য দেখেই চমৎকৃত তাই নয়, অভিজাতরা আরও আহ্লাদিত জিপসী সম্পর্কে লুইয়ের দুর্বলতার কথাটি স্পষ্ট জানতে পেরে। ফলে, পরদিন থেকে তাঁরা জিপসী মেয়েদের পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। প্রকাশ্য দিবালোকে সেটা সম্ভব নয়। দেশে আইন আছে, সমাজ আছে, সংসার আছে। সুতরাং, অভিজাতপূর্ণ আইনের তূণ ঘাড়ে ঝুলিয়েই কামনার ধনু হাতে মৃগয়ায় বের হলেন। ভবঘুরেদের বন্দি করে এনে তারা নানা কাজে নিয়োগ করতে লাগলেন। পরিরা সেই সূত্রেই বড়মানুষের কাছে বাঁধা পড়ল। স্বামীরা যখন একাজে-সেকাজে দিন কাটায়, ওরা তখন বিলাসী বিত্তবানদের মনোরঞ্জনের জন্য নাচে, গায়। কেউ কেউ দিনে ফেরি নৌকা বায়, রাতে জলসা ঘরে আসর জমায়। অনেক অট্টালিকায় তখন জিপসী রক্ষীবাহিনী। কেননা, পরিদের হাতের নাগালের মধ্যে রাখতে হলে সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ উপায়, বনের পাখিকে দল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে খাঁচায় পুরলে, কে জানে, হয়তো তার গলা দিয়ে আর সুর বের হবে না। তাছাড়া, পাখি শিকল ছিঁড়ে উড়েও যেতে পারে।

জিপসীর এজাতীয় অনুরাগীর সংখ্যা সেদিন খুব সামান্য নয়। ওদের কালো চুল আর কালো চোখের মায়ায় শুধু রাজা আর বিলাসী অভিজাতরা নন, বন্দিনী অন্তঃপুরের গরবিনীরাও। রঙ্গিণী জিপসীর বেহালা আর খঞ্জনীর বাদ্য তাঁদের নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত রক্তেও যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। জনি ফা'র গানে পাগলিনীপ্রায় স্কটল্যান্ডের লর্ড-ঘরণীর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'ফা এখনও স্কটল্যান্ডের একদল জিপসীর পদবি।

লর্ড বাহাদুর সেদিন রাজকার্যে রাজধানীতে গিয়েছেন। তাঁর রূপসী বউ

প্রাসাদে একা। গ্রীষ্মের দারুণ দুপুর। চারদিকে কেউ কোথাও নেই। লর্ড গৃহিণী একাকী বিরস মধ্যাহ্ন যাপন করছেন। এমন সময় হঠাৎ কানে ভেসে এল জিপসীর রক্তমাতানো বাদ্য। একটি তীক্ষ্ণ, গভীর গলা জীবনের সমস্ত যন্ত্রণা ঢেলে দিয়ে গান গাইছে। সঙ্গে বাজছে বাদ্য। লর্ডের তরুণী-বধূ এ গানের ভাষা বোঝেন না। তবু তাঁর মনে হল এ গান যেন তাঁরই হৃদয়ের কথা। তিনি শয্যা ছেড়ে অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন। তারপর কিছু না ভেবে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন নীচে। ইতিহাস বলে, স্বপ্নে-পাওয়া নায়িকার মতো লেডি অ্যানস্ট্রথার সেই যে তাঁর প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন, কোনদিন আর ফেরানো যায়নি তাঁকে। লর্ড যখন তাঁকে ঘরে ফেরার জন্য মিনতি করেছেন, ভূতপূর্ব লেডির তখন উত্তর—'য়ু ডোন্ট নো দি ডিড্‌স। হোয়াট দ্যাট ইয়ং ম্যান হি ডান!'—ওই তরুণ আমাকে কী দিয়েছে সে আমি তোমাকে বোঝাই কী করে।

তৎকালে জনপ্রিয় ইংরাজি গানে আছে এক লেডি ক্যাসিলিসের কথা। জিপসী তাকে বলেছে : আমাদের সঙ্গে এলে তুমি আর রেশমি গাউন পরতে পারবে না, কোনও পরিচারিকা তোমার চুল বেঁধে দেবে না,...এই উপত্যকা পেরিয়ে, পাহাড় ছাড়িয়ে দূর দেশে চলে যেতে হবে তোমাকে। কিন্তু লেডি ক্যাসিলাস তবু পিছু হটতে রাজি নন।

জিপসীর গানে ঘরে ঘরে যেন বিবাগিনী। তাই বোধহয় স্থানীয় কবিরা তাদের ঘরে আটকে রাখবার জন্য তখন রকমারি কাহিনি ফাঁদতে ব্যস্ত। একটি গানের প্রতিপাদ্য—রাজকুমারী ও জিপসী। গাছের পাতা সবুজ। জানালা দিয়ে তাকিয়ে রাজকুমারী বললেন—আমি আর মাথায় মুকুট পরব না। আমি আর রানি সেজে থাকব না। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমেই তিনি দেখেন একদল জিপসী চলেছে। তাদের গায়ের রং বাদামি। তিনি বললেন—আমাকে তোমাদের সঙ্গে নাও। জিপসীরা বলল—আমাদের সঙ্গে এলে তোমাকে কী দাম দিতে হবে তা-ই একবার ভেবে দেখো। এখন বসন্ত বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে শীত আসবে। অনেক কষ্ট সামনে। ওরা রাজকুমারীর সামনে নিজেদের জীবনের একটা ভয়াবহ ছবি তুলে ধরল। মেয়েটি পিছিয়ে গেল। আবার সে ফিরে এল প্রাসাদে।

কিপ্‌লিং এক কবিতায় বলেছেন—সেটাই ভালো। রাতদিন যারা চুরি করছে তুমি যদি সেই জিপসীদের কেউ না হও, তবে তোমার হৃদয়কে ডবল-তালায় বন্দি করে চাবিটা কোথাও ছুঁড়ে ফেলে দাও। কেননা, জিপসীর যা মানায়, তোমার তা মানায় না। তুমি খোলা আকাশের নীচে যেয়ো না। চাঁদ যদি একান্তই দেখতে চাও, তবে জানালা দিয়ে দেখ। বাড়ির সামনে দিয়ে যখন জিপসী-ভ্যান

যাবে তখন তোমার পক্ষে চোখ বুঁজে থাকাই শ্রেয়।

এসব সুপরামর্শ যে সবাই কানে তুলতে রাজি নন, তার প্রমাণ রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন দি গ্রেট।

রুশ সাম্রাজ্ঞী সেদিন অলিন্দে দাঁড়িয়ে শীতের সন্ধ্যা উপভোগ করছিলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল দূরে রাজপথ দিয়ে একটি বিদেশি তরুণ একাকী হেঁটে চলেছে। তার দীর্ঘ দেহে বন্য স্বাস্থ্য, হাতে কী যেন একটি বাদ্যযন্ত্র। দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, তরুণটির চেহারায় একটা আদিম সারল্য এবং লাবণ্য রয়েছে যা এই অস্পষ্ট সন্ধ্যা আর শতচ্ছিন্ন পোশাকও গোপন করে রাখতে পারছে না। যারাই পাশ দিয়ে যাচ্ছে তারাই একবার ছেলেটির দিকে তাকাচ্ছে। ক্যাথারিন সুরসিকা সাম্রাজ্ঞী। তিনি ইঙ্গিতে রাজকুমার প্রোটেম-কিনকে কাছে ডাকলেন। তারপর আপন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। —ওই তরুণটিকে সামনাসামনি দেখতে পেলে আমি প্রীত হব।

এক ঘণ্টার মধ্যেই ভবঘুরে জিপসীকে এনে হাজির করা হল সম্রাজ্ঞীর খাস কামরায়।—কিন্তু একী? জিপসীর সদ্যস্নাত দেহে পরিচ্ছন্ন জমকালো পোশাক। তার গা থেকে আতরের উগ্র গন্ধ বের হচ্ছে। কোথায় সেই আদিম যুবা? সন্দেহ নেই, পারিষদেরা ওকে স্নান করিয়ে সভ্যসাজে রানির কাছে পাঠিয়েছেন। ক্ষুব্ধ ক্যাথরিন সখেদে বললেন—আমি তোমাকে নিজের পোশাকেই দেখতে চেয়েছিলাম, এ বেশে নয়।

তরুণ জিপসী সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার তীক্ষ্ণ কালো দুটি চোখ সাম্রাজ্ঞীর চোখে বিদ্ধ করে ধীরে ধীরে বলল—আমিও তোমাকে আপন পোশাকেই দেখতে চেয়েছিলাম, এই রানির সাজে নয়।

তার ঔদ্ধত্য দেখে ক্যাথারিন স্তম্ভিত। তিনি রাগে কাঁপতে লাগলেন।—তাহলে এই জিপসীও জানে, আমি একদিন পথের মেয়ে ছিলাম। তিনি আদেশ দিলেন—উদ্ধত এই ভবঘুরেকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে সারা রাত্রি খোলা আকাশের নীচে দাঁড় করিয়ে রাখ। কাল সকালে আমি দেখতে চাই, সে তার হঠকারিতার সমুচিত জবাব পেয়েছে।

তাই করা হল। আগাগোড়া গরম পোশাকে মুড়ে একজন রুশ সৈন্যকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হল উলঙ্গ জিপসীর পায়ের সঙ্গে। সৈন্যটি প্রহরীর কাজ করবে। শীতের রাত। রুশ রাজধানীতে সে রাত্রে তাপমাত্রা শূন্যের নীচে চল্লিশ ডিগ্রি।

সকালে সম্রাজ্ঞী নিজেই প্রাসাদ থেকে নেমে এলেন তাঁর নিষ্ঠুরতার ফলাফল যাচাই করতে। কিন্তু চোখের সামনে তাঁর এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। ক্যাথারিন অবাক

হয়ে দেখলেন রুশ প্রহরী মরে প্রায় বরফে পরিণত। আর তার পাশেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে নির্বিকার জিপসী তরুণ।

তারপরও কি উষ্ণ আলিঙ্গনে উদ্ধত জিপসীকে আপন ক্ষমার কথা জানাতে পারেননি ক্যাথারিন? ইতিহাস কিন্তু বলে—হৃদয়ের খেলায় রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন দি গ্রেট এক অবিশ্বাস্য আদিম রমণী। তাঁর কোনও সংস্কার ছিল না। লৌকিকতারও তিনি নাকি খুব মূল্য দিতেন না।

এই জিপসী তরুণকে নিয়ে সম্রাজ্ঞী শেষ পর্যন্ত কী করেছিলেন আমরা জানি না। তবে এটুকু জানি, ইউরোপের রানিদের মধ্যে তিনিই একমাত্র জিপসী-পাগলিনী নন। স্কটল্যান্ডের মেরি, হাঙ্গেরির মারিয়া টেরোস, রাশিয়ার দ্বিতীয় কাথারিন জিপসীদের জন্য যে ব্যাকুলতা দেখিয়েছেন সেদিন, তা একমাত্র একালের ধর্মযাজক কিংবা সমাজসংস্কারকদের উদ্যমের সঙ্গেই তুল্য। রানি মেরি রাজকীয় আনন্দসভায় সস্নেহে জিপসীদের ঠাঁই করে দিয়েছিলেন। মারিয়া টেরেসা ওদের ভবঘুরে জীবনের উপসংহার ঘটানোর জন্য দু হাতে পয়সা খরচ করেছেন। হাঙ্গেরির সুরেলা ভবঘুরেদের নাম দিয়েছিলেন তিনি—'নিউ হাঙ্গেরিয়ান'। জিপসীর কাছে অবশ্য তা ছিল নয়া-উপদ্রবের সামিল। কিন্তু রানির সদিচ্ছার কথা বোধহয় তাতে অপ্রমাণিত হয় না। রুশ সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিন রাজকীয় খাস এলাকা বিলিয়ে দিয়েছিলেন জিপসীদের মধ্যে, স্বদেশের মাটিতে তাদের স্থায়ীভাবে আটকে রাখার জন্য। সন্দেহ নেই, এঁদের এইসব উদ্যোগ আয়োজনের পেছনে নারীসুলভ মমতা তথা মানবতাবোধ অনেকখানি প্রেরণা জুগিয়েছিল। কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য সম্ভবত এই যে, ছন্নছাড়া ওই মানুষগুলোকে তাঁরা ভালোবেসেছিলেন। জিপসীর যদৃচ্ছ জীবনযাত্রার মধ্যে তাঁরা বোধহয় এক ধরনের পরিপূর্ণতার আভাস পেয়েছিলেন। জিপসীকে চোখের সামনে রেখে তাঁরা মনে মনে সম্পূর্ণ হতে চেয়েছিলেন। বিলাসিনীরা তাই ওদের হারাতে চাননি। খাঁচায় দেশ-দেশান্তরের পাখি থাকে। দেশে দুনিয়ার সেরা পাখি কিছু জিপসী যদি থাকে তো ক্ষতি কী।

বলতে গেলে, জিপসী নিয়ে আড়ালে সেদিন কোনও কোনও দরবারে কাড়াকাড়ি।

ভিয়েনার সেই ভুবনবিজয়ী নায়কের নাম ছিল বিহারী। ১৮২৫ সনের কথা। দরবারে বিহারীর ডাক পড়ল, গান গাইতে হবে। উজ্জ্বল প্রাণচঞ্চল তরুণ সমবেত ভদ্রজনদের অভিবাদন জানিয়ে বেহালায় হাত দিল। তার হাতের যন্ত্রে যেন দেবলোকের সুর। সম্রাট মুগ্ধ। ততোধিক মুগ্ধ পর্দার আড়ালে বসা অভিজাত ঘরের মেয়েরা। এমন চোখ কোথায় পেল এই তরুণ গায়ক?—কোথায় পেল

এই সুর? এমন মধুর গলা বোধহয় একমাত্র অরফিউসেরই ছিল। সকলের অলক্ষ্যে বিহারী একসঙ্গে অনেক মনে আগুন ধরিয়ে দিল।

গান শেষে সম্রাট বললেন—জিপসী গায়ক, আমি অভিভূত। আমি তোমাকে পুরস্কৃত করতে চাই—বলো, কী চাই তোমার?—আমি তোমাকে রাজকীয় খেতাবে ভূষিত করতেও সম্মত।

বিহারী নীরবে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল—সম্রাট, খেতাব যদি দিতেই হয় তবে আমাকে নয়, দিতে হবে আমার দলকে। আমরা জিপসী, দল ছাড়া আমাদের কোনও ব্যক্তিগত পরিচয় নেই, সম্মান নেই।

অতুলনীয় রূপ আর দুর্লভ কণ্ঠস্বরের সঙ্গে এই অবিশ্বাস্য নম্রতা। বিহারী মুহূর্তে অপ্রতিরোধ্য নায়কে পরিণত হল। পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এলেন রাজকুলবালারা। প্রত্যেকেই আপন কক্ষে বসে একান্তে এই ভবঘুরে গায়কের গান শুনতে চান। পথের মানুষ বিহারীর জন্য তাঁদের প্রত্যেকের আন্তরিক নিমন্ত্রণ।—বল্ বিহারী, কাল তাহলে আমার এখানে আসছ?

—না, কাল আমার এখানে। যেন কোনও রূপকথার নায়ক হঠাৎ কোনও পাষাণপুরীতে এসে হাজির রয়েছে। তার পায়ের স্পর্শে কক্ষে কক্ষে ঘুমিয়ে থাকা সুন্দরীদের ঘুম ভেঙে গেছে। তারা সকলেই আগন্তুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়।

শোনা যায়, সে-প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত বিজয়িনী হয়েছিলেন ইতালির রাজকুমারী মারি লুইস। তিনি বিবাহিতা। রাশিয়ার সম্রাট তাঁর স্বামী। জার-পত্নী মারি পদাধিকার বলে জারিনা। ভালো করে পরিচয়ের পর জারিনা একদিন হাসতে হাসতে বললেন—বিহারী, আমি তোমার ঘরণীকে একবার দেখতে চাই। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে, তোমার চঞ্চল কালো চোখ দুটি কেন কখনও কোনও কিছুতে স্থির হয়ে একটু বিশ্রাম নিতে চায় না। সব সময়ই বনের হরিণের মতো তুমি কেন এমন অস্থির?

জারিনার আদেশ মতো বিহারী একদিন তার স্ত্রীকে নিয়ে এসে হাজির হল। মারি ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন মেয়েটিকে। অপূর্ব রূপসী জিপসী তরুণী। কোমর অবধি ঢেউ খেলানো কালো চুল, টানা টানা বড় বড় দুটি চোখ, টিকালো নাক, চওড়া কপাল। রাশিয়ার জারিনার মনে হল, রূপে এ-মেয়ের কাছে তিনি যেন কিছুই না।

পরের দিন মারিই কথা বললেন, আগে।—বিহারী, আমি হার মেনেছি। তোমার ছুটি। মিছেই আমি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি। আমি জেনে গেছি—কোথায় তুমি বিকিয়ে আছ!

এ কাহিনি ইতিহাসের পাতা থেকে কুড়িয়ে নেওয়া। ইউরোপীয় সাহিত্যে দেখা মেলে আরও কোনও কোনও বিহারী-র! ওরা মায়া-পুরুষ, ওদের ধরা যায় না।

ডি এইচ লরেন্স এক গোর্গিও মেয়ের গল্প লিখেছিলেন। জিপসীর আড্ডায় উঁকি দিতে গিয়ে হঠাৎ এক তরুণের চোখে তার চোখ আটকে গিয়েছিল। তারপর সেই চোখ নিয়ে স্বপ্নের জাল বোনা। যুবকটি মাঝে মাঝে ওদের পল্লিতে এটা-সেটা ফিরি করে আসত। মেয়েটির বাড়ির সামনে দুদণ্ড দাঁড়াত, তারপর আবার নিঃশব্দে নিজের পথে হাঁটত। কোনও কোনও দিন দু'জনের চোখাচোখি হত, তরুণীর রক্তে সেদিন চাঞ্চল্য। এমনি করেই দিন কাটছিল। অবশেষে ওই এলাকায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বন্যায় সব ডুবুডুবু। মেয়েটির বাড়িও ভেসে যায় প্রায়। যতদূর মনে পড়ে, বোধহয় ভেসে যাচ্ছিল সে নিজেও। কে যেন তাকে লুব্ধ সমুদ্রের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে এল উপরতলার একটি ঘরে। তার পোশাক পরিচ্ছদ সব ভিজে গেছে। শীতে এবং ক্লান্তিতে সে কাঁপছে। জিপসী যুবক তার নগ্ন শরীরটিকে বিছানায় শুইয়ে দিল। তারপর নিজের নগ্ন দেহের উত্তাপে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল। মেয়েটি জেগে দেখল সে নেই—কখন যেন পালিয়ে গেছে।

ওরা পালিয়ে যায়। তা সে জিপসী ছেলেই হোক, আর মেয়েই হোক। একজন ব্রিটিশ জিপসী প্রেমিক তাঁর নিজের চোখে দেখা একটা ঘটনার কথা লিখেছেন। সেদিন ওদের আড্ডায় গিয়ে দেখেন, তার জিপসী বন্ধু বিষণ্ণ মুখে বসে আছে। অনেক পীড়াপীড়ি করার পর তার মন খারাপের কারণটি জানা গেল,—ছেলে এক গেভার-এর মেয়ের প্রেমে পড়েছে! 'গেভার' রোমানি শব্দ। অর্থ—পুলিশম্যান। অর্থাৎ, একেবারে শত্রুপক্ষের মেয়ে। ছেলের মা বাবা অতএব খুবই চিন্তিত। চিন্তার কারণ—এ বিয়ে সুখের হওয়া শক্ত।—তুমিই বলো, রোমানিদের সঙ্গে গোর্গিওদের কি কখনও বিয়ে-সাদি চলে? ক'দিন পরে লেখক আড্ডা দিচ্ছেন, তখন ছেলেটি এসে হাজির। তার জামা ছিঁড়ে গেছে, চুল উস্কো-খুস্কো। মা বাবা স্বভাবতই ছুটে গেল।—কী হল?—তোর এমন দশা হল কী করে? ছেলেটি লজ্জায় মাথা নিচু করে রইল। লেখক তাকে কাছে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে যা শুনলেন, তার মর্ম : পুলিশের ওই মেয়েকে একটি গোর্গিও ছেলেও নাকি ভালোবাসত। আজ যখন সে তার বান্ধবীকে নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছিল, তখন দ্বিতীয় নায়ক এসে হাজির। দু'জনে খুব মারপিট হল। মেয়েটি তখন রেগে গিয়ে বলে—আমি চললাম, আজ থেকে দু'জনের কারও আমি মুখ দেখব না। দুই তরুণ মিলে তখন একটি পাব-এ বসে নিজেদের ঝগড়া

মিটিয়ে নেয়। ওই মেয়ের দিকে তার আর কোনও আকর্ষণ নেই। বাবাকে সে বলল—কই, তোমরা যে ভ্যান নিয়ে অন্য দিকে যাবে বলছিলে তার কী হল! বোঝা যায়, একটা ছুতো দেখিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পেরে খুশি।

আর একজন বেলজিয়ান লেখক লিখেছেন : অনেক দিন ধরে ওদের সঙ্গে আছি। দলপতি স্থির করলে এবার আমার বিয়ে দিয়ে দেওয়া দরকার। পাত্রীও ঠিক হয়ে গেল। সে রাত্তিরেই আমার অভিভাবক জিপসীর এক মেয়ে গোপনে ডেকে নিয়ে আমাকে বলল—খবরদার, এ বিয়েতে কিছুতে তুমি রাজি হয়ো না। কেন মিছিমিছি নিজেকে ঠকাবে, একটি নিরপরাধ জিপসী মেয়েকেও ঠকাবে। তুমি জানো, তুমি চিরদিন আমাদের সঙ্গে থাকবে না। অথচ পিছনে রেখে যাবে একগাদা ছেলেমেয়ে আর একটি দুঃখী বউ। নিজেই কি তুমি তখন খুব সুখে থাকতে পারবে ভেবেছ? মেয়েটির কণ্ঠস্বরে উত্তাপ ছিল, আবেগ ছিল। লেখক লিখেছেন: আমি তক্ষুনি মন স্থির করে ফেললাম। দলপতির কাছে গিয়ে বললাম—আমি এখন বিয়ে করব না।

জিপসী তরুণ-তরুণী গোর্গিওদের সঙ্গে কেন সহসা হৃদয় বিনিময় করতে চায় না, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন পুসকিন। তাঁর লেখা সেই গল্পটির নাম—'জিগানী'। এক সম্ভ্রান্ত রাশিয়ান নানা কারণে তাঁর পরিবেশের উপর বিরক্ত হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। তিনি স্থির করেন, অতঃপর তিনি প্রকৃতির সন্তান জিপসীদের সঙ্গেই জীবন কাটাবেন। জিপসীরা তাঁকে গ্রহণ করল। একটি জিপসী মেয়েকে ভালোবেসে তিনি বিয়েও করলেন। কয়েক মাস বেশ সুখে কেটে গেল। কিন্তু পুরনো স্বভাব তিনি কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। থেকে থেকেই চাড়া দিয়ে ওঠে তাঁর নীল রক্ত। জিপসীকন্যার মনে সুখ নেই। এই বয়স্ক ভদ্র স্বামী ক্রমেই তার পক্ষে বিরক্তিকর হয়ে উঠছেন। সে একটি জিপসী তরুণের মধ্যে নতুন করে সুখের সন্ধান পেল। ওদের ইচ্ছা, দু'জনে একসময় কোনও দিকে পালিয়ে যায়। কিন্তু রুশি প্রভু তা ধরে ফেলেন। রেগে গিয়ে তিনি দু'জনকেই গুলি করে মেরে ফেলেন। তার প্রতি বুড়ো জিপসী দলপতির কথা : তুমি স্বাধীনতা চেয়েছিলে। এখন আমি বুঝতে পারছি, স্বাধীনতা বলতে তুমি নিজের স্বাধীনতাই চাইছিলে।

ওরা অতএব সহসা ধরা দিতে চায় না। সুযোগ পেলেই উড়ে যায়।

ঝাঁকের পাখি ফিরে আসে ঝাঁকে। বিহারীও ফিরে এল দলে। ঐশ্বর্য, সুখ, প্রশংসা, বদান্যতা কিছুই তাকে বেঁধে রাখতে পারল না। বিহারী আপন দলের সঙ্গে আবার কণ্টকাকীর্ণ দুঃখের পথে পা বাড়াল। জিপসী আবার তার

ভালোবাসার জীবন ফিরে পেল। রাজকীয় ঔদার্য ওদের কাছে তৎকালে পথের ধারে ছায়া-দায়ী গাছের মতো, তলায় বসে দু'দণ্ড জিরিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু জীবনভর আঁকড়ে পড়ে থাকা—অসম্ভব।

বলা নিষ্প্রয়োজন, শুধু রাজকীয় কৌতূহল আর দাক্ষিণ্য নয়, ইউরোপের জিপসী যে প্রবল ঝড়ের মধ্যেও তাদের তাঁবুগুলো খাড়া রাখতে পেরেছিল, তার পিছনে ছিল সমাজের আরও একটি বিশেষ শ্রেণির আন্তরিক পৃষ্ঠপোষণা। সেদিনের ইউরোপে যারা 'বিপজ্জনক শ্রেণি' হিসাবে চিহ্নিত, সেই ভিখারি-ভবঘুরে-লুঠেরার দল নিশ্চয়ই নানা ব্যাপারে জিপসীর নৈপুণ্য এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছে। পরিবর্তে জিপসী তাদের সহযোগিতা এবং সমর্থনও হয়তো লাভ করেছে। কিন্তু এই শ্রেণিটির সঙ্গে জিপসীর সম্পর্ক একটু অন্য ধরনের। আমরা ইউরোপের লেখক এবং শিল্পী সমাজের কথা বলছি। রাজন্যবর্গ যখন জিপসী রূপসীর হাতে রাশি রাশি সুবর্ণমুদ্রা গুঁজে দেওয়ার ফিকির খুঁজছেন, সম্ভ্রান্তরা যখন কৃষ্ণবর্ণ আফ্রিকান রমণীর বদলে তাম্রবর্ণ পূর্বদেশীয় সুন্দরীকে শহরতলির বাগানবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন, ওরা তখন প্রকাশ্যে জিপসী-বন্দনায় মেতে উঠেছেন। কেউ কেউ বরণ করে নিয়েছেন ওদের স্বতঃস্ফূর্ত মুক্ত স্বাভাবিক জীবনধারা। এঁদের উৎসাহেই ইউরোপীয় রোমান্টিক আন্দোলনে জিপসী এক বিশিষ্ট অস্তিত্ব। জিপসীর অসংস্কৃত রূপ, তাও পথপ্রেম, ঔদাসীন্য, বন্ধনহীন মুক্ত জীবনের প্রতি তার অদম্য আকর্ষণ এঁদের চোখের সামনে যেন এক নতুন জগতের দুয়ার খুলে দিল। সে জগৎ ছিন্নভিন্ন, খণ্ড কিংবা বিক্ষিপ্ত নয়—উদার, বৃহৎ, অখণ্ড। সেখানে আইন নেই, নিয়মের কড়াকড়ি নেই, দৈনন্দিনতার পীড়ন নেই, একঘেয়েমির ক্লান্তি নেই। জীবনে সেখানে নিত্যনতুন চমক, নব নব অভিজ্ঞতা, প্রতি বাঁকে নতুন নতুন ঝুঁকি। মানুষ সেখানে চিরস্বাধীন, প্রকৃতির দুরন্ত অবাধ্য সন্তান সে। জিপসীর ডুগডুগি ওঁদের সেই খেলাঘরে আহ্বান জানাল। শিশু যেমন বেরিয়ে আসে, ওঁরাও তেমনি বেরিয়ে এলেন জিপসীর ডাকে। কারও হাতে কলম, কারও হাতে তুলি, কারও হাতে প্রিয় বাদ্যযন্ত্রটি।

ফরাসি কবি ভিয়োঁ (Francois Villon) ১৪৫৫ সনে রাজধানী থেকে পালিয়ে গেলেন। তিনি ভবঘুরে ভিখারিদের সঙ্গে মিশে গেলেন। ক্ষণিকের জন্য ফিরে এসে আবার তিনি যোগ দিলেন বেপরোয়া সেই অসামাজিকদের সঙ্গে। পুরো ছ'বছর ছিলেন তিনি ভিখারিদের দলে। অনেকের ধারণা, ভিখারিদের আপন রাজ্যে তিনি ছিলেন রাজকবি। তাঁর কবিতা পড়ে কারও কারও অনুমান

ভিঁয়ো আসলে বছরগুলো কাটিয়েছেন বিদেশি জিপসীদের সঙ্গে।

তারপর একে একে আরও কত অভিযাত্রী; নদিয়ের (Nodier), ভিক্টর হুগো (Hugo), নার্ভাল (Nerval), মেরিমে (Merimee), মলিয়ের (Moliere) গতিয়ের (Gautier), বোদলেয়ার (Baudelaire)। জিপসী ফরাসি দেশে এক দুর্নিবার আকর্ষণ। বিখ্যাত নাট্যকার সেখানে জিপসীকে নিয়ে নাটক লেখেন, খুঁজেপেতে জিপসী মেয়ে ধরে এনে তাকে মঞ্চে নামান, ঔপন্যাসিক জিপসী মেয়েকে নিয়ে উপন্যাস লেখেন, কবি—কবিতা। ভিক্টর হুগো সৃষ্টি করলেন অবিস্মরণীয় জিপসী বালিকা এসমিরাল্ডাকে। তাঁর ওই উপন্যাসটি নাকি পুরোপুরি কাল্পনিক নয়, পুরনো সরকারি কাগজপত্র ঘেঁটে তার ভিত্তিতে রচিত। মেরিমের (MeriMee) জিপসী অবশ্য নকল জিপসী, কিন্তু রসিকেরা বলেন—অনবদ্য। ওই কাল্পনিক মানুষগুলোর মৃত্যু নেই। গতিয়ের লিখলেন স্পেনের 'গিতানোস'দের নিয়ে। তাদের রূপ-বর্ণনায় তিনি রীতিমতো উচ্ছ্বাস-প্রবণ : গায়ের রং ওদের কালো। তাই ওদের পূর্বদেশীয় চোখগুলোর স্বচ্ছতা আরও স্পষ্ট। সে চোখ কোন্ অজ্ঞেয় বেদনায় যেন কিছুটা নম্র। সে বেদনা হয়তো হারিয়ে যাওয়া মাতৃভূমি কিংবা গৌরবের দিনগুলোর জন্য। ওদের ঠোঁট কিছুটা পুরু, রং উজ্জ্বল। দেখলে আফ্রিকার প্রস্ফুটিত ঠোঁটের কথা মনে পড়ে যায়।…তাদের প্রায় সকলের চলনভঙ্গিতে স্বাভাবিক রাজসিকতা আর সহজ স্বাধীনতার স্পর্শ। ওরা যখন ঈষৎ বাঁকা হয়ে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন নোংরা ছেঁড়া পোশাকপরিচ্ছদ, দারিদ্র সব তুচ্ছ হয়ে যায়। মনে হয়, ওরা ওদের জাতির প্রাচীনত্ব এবং শুদ্ধতা সম্পর্কে তখনও যেন সম্পূর্ণ সজাগ।

বোদলেয়ারের কাছে আরও আকর্ষণীয় ছিল কৃষ্ণকায় আফ্রিকান রমণী। কিন্তু জিপসী বন্দনায় তিনিও মুখর। তাঁর সুন্দর কবিতাটির মোটামুটি বক্তব্য : জিপসী মেয়েরা পিঠে বাচ্চা নিয়ে পথে নেমেছে গতকাল। কখনও তারা সতত প্রস্তুত হেলে-পড়া স্তনে সন্তানের দুর্দম ক্ষুধাকে তৃপ্ত করছে। পুরুষেরা গাড়ির পাশে ঝকঝকে অস্ত্র নিয়ে হাঁটছে। ওই গাড়িতে সওয়ারি ওদের পরিবার। মাঝে মাঝে তারা ঘোলা চোখে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে।...তার বালির ঘর থেকে ঝিঁঝি পোকা ওদের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে আবার গান ধরেছে।…এই পথিক দলের সামনে রয়েছে সুপরিচিত ভবিষ্যত—এই অন্ধকারের রাজ্য।

কবি যখন জিপসীর পথের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন, শিল্পীরা তখন চাইছেন ওদের রঙে-রেখায় ধরে রাখতে। জিপসী, বিশেষত জিপসী-মেয়েদের হাত

দেখা ইউরোপীয় চিত্রশিল্পে একটি বিশেষ বিষয়। ভিখারি তথা জিপসী মেয়ের ছেঁড়া জামাকাপড় কোনও ঐশ্বর্যই গোপন করতে পারে না। ওদের চামড়ার রং, দেহের গড়ন দিনের পর দিন অনিমেষ নয়নে দেখবার মতো।—তাই নয় কি? সেখানেই থেমে গেলেন না ওরা। ওই জীবনের লালসায় একদল তরুণ শিল্পী নিজেরাই বোহেমিয়ান হয়ে গেলেন। প্যারিসের বিখ্যাত বোহেমিয়ানরা আসলে বোহেমিয়ান নামে বর্ণিত জিপসীদের অনুকরণেই ভিন্ন জীবনাচারী সেদিন। সে-জীবন বাঁধা ছকের বাইরে—যদৃচ্ছ।

উনিশ শতকে একই রোমান্টিক হাওয়া প্রবল বেগে বয়ে চলেছে ইউরোপের নানা দেশে। রাশিয়ার তরুণেরা নাচে গানে উদ্দাম হতে চাইলেন। জার্মানিতে আবির্ভূত হলেন জিপসীর জীবন ভাষ্যকারের দল। তাঁদের নামের তালিকা দীর্ঘ। একজন লেখক, আরনিম (Arnim) 'ইজিপ্টের ইসাবেলা'কে নিয়ে এক উপন্যাস লিখেছিলেন। কাহিনিটি আর্চ ডিউক চার্লস বা পরবর্তীকালের পঞ্চম চার্লস আর জিপসী মেয়ে ইসাবেলাকে নিয়ে। ইসাবেলার বাবা সেই বিখ্যাত ইজিপ্টের ডিউক মাইকেল। কিন্তু মা ছিল তার আসলে একজন সম্ভ্রান্ত ডাচ মহিলা। শেষ পর্যন্ত ইসাবেলা 'ইজিপসিয়ানদের' রানি হয়। উপন্যাসের শেষে লেখকের ভবিষ্যদ্বাণী : জিপসীরা আবার একদিন খুঁজে পাবে তাঁদের মাতৃভূমি। সেদিন তাদের নেতৃত্ব দেবে যে-তরুণ, সে জন্ম নেবে জিপসী রাজকুমারীর গর্ভে, আর তার পিতা হবেন একজন বিখ্যাত সম্রাট!

স্পেনে ওদের জীবন বর্ণনা করতে কলম ধরলেন স্বয়ং সার্ভান্টিস (Cervantes)। তাঁর 'ছোট জিপসী মেয়ে'র কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সার্ভান্টিস 'গিতানোস' আর গৃহস্থের মধ্যে মৌলিক যে পার্থক্য তা ধরতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু জিপসী সম্পর্কে তাঁর মনে নাকি কিঞ্চিৎ কুসংস্কারও ছিল। তিনি মনে করতেন, ওরা স্বভাব-দুর্বৃত্ত, চিরকালের তস্কর। আধুনিক গবেষকরা খুঁজেপেতে আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁর নিজের পরিবারেই জিপসী মেয়ে ছিল একটি, গৃহস্থ ঘরে সে স্ত্রী হিসাবে ঠাঁই করে নিয়েছিল। মেয়েটি সম্পর্কে সার্ভান্টিসের পিসি, কিংবা মাসি।

ইংল্যান্ডে শেক্সপীয়র থেকে শুরু করে ওয়াল্টার স্কট প্রমুখ অনেকের জীবনেই উঁকি দিয়েছে জিপসী। তবু ইংরেজি সাহিত্যে তার সুবর্ণ যুগের সূচনা বলা চলে সুখ্যাত জর্জ বরোর (G. Borrow) হাতে। অনেক বই লিখেছেন বরো জিপসীদের নিয়ে। বস্তুত জিপসীদের জীবন-রহস্য, তাদের বিচিত্র রীতিনীতি যারা গভীর ভাবে অনুধাবন করতে চান, বরোর রচনাবলী তাঁদের কাছে বিশ্বকোষ তুল্য।

নিজের জীবনও তাঁর রহস্য-উপন্যাসের নায়কের মতো। বরো জিপসীর পিছু

নেন মাত্র চোদ্দো বছর বয়সে। সেটা ১৮১৭ সনের কথা। ওরা তাঁর আন্তরিকতা দেখে তাকে শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে দিতে পারল না। তিনি ওদের ভাষা শিখলেন। গাছের ছাল থেকে রং তৈরি করে নিজের সাদা মুখ বাদামি করলেন। তারপর দিন কাটাতে লাগলেন ওদের সঙ্গে। ষোলো বছর বয়সে তিনি রীতিমতো একজন ভাষাবিদ্।

১৮২৫ সনে তিনি লন্ডন থেকে একটা হালকা গাড়ি আর গাধা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন গোটা দেশ একবার ঘুরবেন বলে। পেশা হিসাবে বেছে নিলেন টিন-মিস্ত্রির কাজ। সে সময়েই হঠাৎ একাকিনী এক জিপসী মেয়ের সঙ্গে তার দেখা। বরো তার প্রেমে পড়ে গেলেন। এই প্রেমের কথা মেয়েটিকে বোঝাবার জন্য আরমানি ভাষায় 'ভালোবাসা' শব্দের সম্পূর্ণ ধাতুরূপ নাকি মুখস্থ করেছিলেন তিনি। মেয়েটি আরমানি ছিল কিনা তাই।

এর পর অভিযাত্রী বরো রওনা হলেন ফ্রান্সে। তারপর দক্ষিণ ইউরোপে। তিনি দুয়ারে দুয়ারে বাইবেল ফিরির কাজ নিলেন। সেই সূত্রেই দীর্ঘকাল কাটালেন রাশিয়ায়। তারপর কিছুকাল স্পেনে। স্পেনের জিপসীদের নিয়ে তাঁর বিখ্যাত বইটি (দি জিনকালি) প্রকাশিত হয় ১৮৪১ সনে। ক্রমে একের পর এক আরও নানা চাঞ্চল্যকর বই। 'ল্যাভেনগ্রো', 'রোমানি রাই', 'বাইবেল ইন স্পেন' ইত্যাদি। আজকের পাঠকের কাছে মনে হতে পারে, বরো অতি রোমান্টিক, অতি নাটকীয়। বিশেষত, তাঁর অধিকাংশ বক্তব্যই তিনি প্রকাশ করেছেন উপন্যাসের মোড়কে, সেখানে বাস্তব এবং কল্পনার পার্থক্য নির্ণয় সব সময় সহজসাধ্য নয়। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই—জিপসীকে উনিশ শতকের বিশ্বে যারা মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, জর্জ বরো তাঁদের অগ্রগণ্য। ইংল্যান্ডে তো বটেই অবশিষ্ট ইউরোপেও তিনি জিপসীর স্বপক্ষে অক্লান্ত প্রচারক। বরো সত্যই ভালোবেসেছিলেন তাঁর রোমানি বন্ধুদের। তিনি জিপসীকে তুলনা করেছেন কোকিলের সঙ্গে। বরো বলেন—প্রত্যেকে ওদের নিন্দা করে। কোকিল কালো, ওরাও কালো, কোকিল অস্থির, বাসা বাঁধে না, ওরাও কোথাও শিকড় বিস্তার করতে চায় না। তবু কোকিল না থাকলে মানুষ যেমন দুঃখ পাবে, জিপসীকে হারালেও বিশ্ব তেমনই বিষণ্ণ বোধ করবে!

প্রসঙ্গত বলা দরকার, আমাদের সাহিত্যেও যাযাবর তথা বেদে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র 'মহুয়া'র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তার কাহিনিটি বাঙালি পাঠকের প্রায় সকলেরই জানা। তবু নতুন করে আর একবার শুনতে দোষ নেই।

হিমালয়ের নীচে বিস্তীর্ণ উপত্যকায় বেদেরা দলবদ্ধ ভাবে বাস করে। তারা নানা ধরনের খেলা দেখায়। তবে তাদের অন্যতম পেশা ডাকাতি করা। ধনু নদীর ধারে কাঞ্চনপুর গাঁয়ে ডাকাতি করতে গিয়ে হোমরা বেদে ছয় মাসের এক শিশুকে নিয়ে এসেছিল। সেই মেয়েটিই মহুয়া।

বেশ কিছুকাল পরের কথা। মহুয়া বড় হয়েছে। তার যেমন রূপ, তেমনি গুণ। সে নানা ধরনের খেলা শিখেছে, দড়ির উপর দিয়ে হাঁটতে তার জুড়ি নেই। সেবার হোমরা বেদে আর তার ভাই মানিক দলবল নিয়ে চলেছে নীচে জনপদের দিকে। তারা খেলা দেখিয়ে কিছু রোজগার করে আবার নিজেদের দেশে ফিরে আসবে, এই ইচ্ছে। সঙ্গে তাদের মহুয়া।

দলে তাদের নানা বয়সের অনেক লোক। তাছাড়া রয়েছে হরেক পশুপাখি। ঘোড়া, গাধা, শেয়াল, শজারু; তোতা, ময়না, দোয়েল—আরও কত কী। এগুলোও সব শিক্ষিত খেলোয়াড়।

ঘুরতে ঘুরতে তারা বামুনডাঙা নামে এক গাঁয়ে এসে হাজির হল। সেখানে একজন তরুণ রাজকুমার ছিলেন। নাম তাঁর—নদের চাঁদ। তিনি বেদেদের ক্রীড়াকৌশল দেখে মুগ্ধ। তার চেয়েও মুগ্ধ তরুণী বেদের মেয়ে মহুয়াকে দেখে। মহুয়া যখন দড়ি থেকে নেমে তাঁর কাছে পুরস্কার চাইল, রাজকুমার তখন গায়ের হাজার টাকা দামের শালটি খুলে দিয়ে দিলেন তাকে। এই মেয়েটিকে যেন কিছুই অদেয় নেই তাঁর।

নদের চাঁদ মহুয়াকে ধরে রাখার বাসনায় গাঁয়ের দক্ষিণে বেদেদের বাড়ি তৈরি করালেন। শাকসবজি চাষের জন্য তিনি জমিও দিলেন তাদের। বেদেরা আপাতত খুব খুশি। তবু থেকে থেকে পাহাড়ের দেশের কথা মনে পড়ে যায় তাদের, আপনা থেকে জলের ধারা নেমে আসে গাল বেয়ে। এমনি করেই দিন চলছিল। হঠাৎ একদিন ঘাটের পথে মহুয়ার সামনে এসে দাঁড়ালেন নদের ঠাকুর। পরদিন আবার। কথাবার্তায় বোঝা যায় দু'জনেই ভালোবেসে ফেলেছে দু'জনকে। কিন্তু মহুয়া স্বভাবতই দ্বিধাগ্রস্ত। ঘরে ফিরে এসে সে সখী পালঙ্কের কাছে সব খুলে বলে পরামর্শ চাইল। পালঙ্ক বলল, তুমি দিন সাতেক বাড়িতে পালিয়ে থাকো, আমি ঠাকুরকে গিয়ে বলব যে, মহুয়া মরে গেছে। কিন্তু মহুয়ার পক্ষে সে অসম্ভব প্রস্তাব। ঠাকুরকে না দেখে সে একদিনও কাটাতে পারবে না।—বঁধুরে লইয়া আমি হব দেশান্তরী। বিষ খাইয়া মরিব কিম্বা গলায় দিব দড়ি।

এদিকে মেয়ের চালচলন দেখে হোমরা বেদের মনে সন্দেহ দেখা দিল। রাত দুপুরে নদের চাঁদের বাঁশির সংকেত শুনে মহুয়া যখন নিঃশব্দে নদীর ঘাটে গিয়ে

তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে, হোমরা বেদে তখন আড়ালে থেকে সব দেখল। রাজকুমার মহুয়াকে আলিঙ্গনে বেঁধে বলছে—চলো, আমরা পালিয়ে যাই। মহুয়া বলছে—না, তা হয় না। আমি এই নদীতে, এই কামনা-সাগরেই ডুবে মরতে চাই। তাহলে আমি পরজন্মে অন্তত তোমাকে পাব। পালিয়ে যেতাম বন্ধু, যদি তুমি ফুল হতে, তবে তোমাকে আমার খোপায় বেঁধে এক্ষুনি আমি বনে পালিয়ে যেতাম।

পালিয়ে গেল বেদেরা। ঘরবাড়ি, ফসল যেমন ছিল তেমনই পড়ে রইল। বেদের দল কাউকে কিছু না জানিয়ে নিশুতি রাতে গাঁ ছেড়ে পালাল। বেচারা মহুয়াকেও বাধ্য হয়ে যেতে হল তাদের সঙ্গে। খবর শুনে নদের চাঁদের মুখের গ্রাস মাটিতে পড়ে গেল। মা তাকে ডাকেন, কিন্তু ছেলের কোনও সাড়া নেই। পাড়াপড়শী সবাই বলতে লাগল—নদের ঠাকুর পাগল হয়েছে। তিনি মহুয়ার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। ঘুরতে ঘুরতে একদিন অবশেষে বেদেদের স্মৃতি-চিহ্ন খুঁজে পেলেন ঠাকুর। পথের ধারে ওদের ব্যবহৃত উনুন, ঘোড়ার খুরের দাগ, ছাগলে খাওয়া ঘাস—এসব দেখে তিনি বুঝতে পারলেন, ক'মাস আগে বেদেরা সাময়িক ভাবে এখানে থেমে ছিল। সুতরাং আবার তিনি চলতে শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত অনেকদিন পরে তিনি সত্যিই বেদেদের সন্ধান পেলেন। অতিথির বেশে নদের চাঁদ তাদের কুটিরে এসে হাজির হলেন। গত ছয় মাস বিরহকাতর মহুয়া ছিল শয্যাগত, অতিথিকে দেখে হঠাৎ তার সে কী উৎসাহ।—ছয় মাসের মড়া যেন উঠি হৈল খাড়া!

কিন্তু হোমড়া বেদের কাছে বেশিদিন অতিথির পরিচয় গোপন রইল না। মহুয়াকে সে হুকুম দিল—ঘুমন্ত ওই ঠাকুরের বুকে এই ছুরিখানা বসিয়ে দাও। নদের চাঁদ তখন নদীর ঘাটে হিজল গাছের নীচে ঘুমিয়ে আছেন। মহুয়া তাকে মারতে গেল বটে, কিন্তু হাতের ছুরি তার হাতেই রইল। দু'জনে একটা ঘোড়ায় চড়ে দূর বনের দিকে পালিয়ে গেল।—চাঁদ সূরুজ যেন ঘোড়ায় চড়িল/চাবুক খাইয়া ঘোড়া শূন্যেতে উড়িল। বহু দূর গিয়ে একটা নদীর ধারে ওরা ঘোড়া ছেড়ে দিল। তারপর হাঁটতে লাগল। কিন্তু এই উত্তাল নদী ওরা পার হয় কী করে? শেষ পর্যন্ত এক ব্যবসায়ী ওদের পারাপার করতে রাজি হল। কিন্তু মহুয়ার রূপ দেখে সে মনে মনে এক ষড়যন্ত্র আঁটল। দুষ্ট সওদাগর নদের চাঁদকে জলে ফেলে দিল। মহুয়াকে সে মিনতি করে বলল—চলো আমার সঙ্গে। তোমাকে আমি রাজরানি করে রাখব। মহুয়া বেদের মেয়ে। সে এই শয়তানের উপর প্রতিশোধ নেয় পানে বিষ প্রয়োগ করে। মাঝিমাল্লা সমেত সওদাগর তখনই ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে।

দুরন্ত মেয়ে মহুয়া এবার নদের চাঁদের সন্ধানে বের হল। তার সংকল্প : তাকে না পেলে এ প্রাণ আর রাখব না!—এই না নদীর জলে ডুবিয়া মরিব/বৃক্ষডালে ফাঁসি দিয়া পরান ত্যজিব।

অনেক ঘুরে বনের ভেতর এক ভাঙা মন্দিরে এসে নদের চাঁদের দেখা পেল সে। নদের ঠাকুর অসুস্থ, তার প্রাণ আছে কি নেই। মহুয়া সেবাযত্ন করে তাকে সুস্থ করে তুলল। কিন্তু আবার ওরা সংকটে। ভাঙা মন্দিরের সন্ন্যাসী তো মহুয়াকে দেখে সন্ন্যাস ত্যাগ করতে চান। তিনি বলেন—আমার কী অপরাধ, স্রষ্টা তোমার মতো এমন রূপসী গড়লেন কেন? তাঁর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য অসুস্থ নদের চাঁদকে কাঁধে নিয়ে মহুয়া আবার পালাল। কিন্তু নতুন আশ্রয়েও বেশিদিন সুখ ভোগ করা হল না ওদের। দুদিন পরেই শোনা গেল বেদেদের বাঁশির সংকেত। সকালে ওরা দেখল, বেদের কুকুর কুটির ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। হোমরার হাতে বিষাক্ত ছুরি।

এবারও হোমরা মহুয়ার হাতেই তুলে দিল ছুরিখানা। তারপর নদের চাঁদকে দেখিয়ে বলল—ও আমাদের শত্রু ওকে হত্যা করতে হবে। আমি তোমাকে দলের সুদর্শন তরুণ সুজনের সঙ্গে বিয়ে দেব। তাকেই আমি জামাতা হিসেবে গ্রহণ করছি। কিন্তু মহুয়া সে প্রস্তাব কানে তুলল না। সে স্পষ্ট জানিয়ে দিল, তার প্রাণপুরুষ এই নদের চাঁদ। পরক্ষণেই বিষ মাখানো ছুরিটা নিজের বুকে বসিয়ে দিল মহুয়া। বেদেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল নদের চাঁদের উপর। অসাধারণ এই বিয়োগান্ত নাটকের এখানেই উপসংহার। তার পরের অংশটুকু হোমরা বেদের আক্ষেপ। তার ধারণা ছিল, নদের ঠাকুর জোর করে মহুয়াকে নিয়ে উধাও হয়েছে। দুজনের মধ্যে এমন গভীর ভালোবাসা তা তার জানা ছিল না। শোকাতুর হোমরা সেই বনেই মহুয়াকে কবর দিয়ে দলবল নিয়ে দেশান্তরে যাত্রা করল। পেছনে রয়ে গেল শুধু সই পালঙ্ক। প্রতিদিন বনের ফুল কুড়িয়ে এনে বান্ধবীর কবরে ছিটিয়ে দেয়, আর—চক্ষের জলেতে ভিজায় কবরের মাটি।

ইউরোপে যে জিপসীরা ঘুরে বেড়ায় তদের সঙ্গে হোমরা, মহুয়া, পালঙ্ক ইত্যাদি আমাদের দেশের বেদেদের যেমন অনেক বিষয়ে মিল রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিস্তর গরমিল। তবু ইউরোপীয় শিল্পসাহিত্যে জিপসীর কথা বলতে গিয়ে মহুয়ার কথা মনে পড়ে গেল, কারণ, বাংলাদেশের লোকমানসের সৃষ্টি 'মহুয়া' সত্যিই বিশ্বের জিপসী নায়িকাদের মধ্যে অনুপমা। এক সময় এই লোকগীতিটি ইউরোপীয় রসিকমহলে যথেষ্ট কৌতূহলও সৃষ্টি করেছিল। একাধিক ইউরোপীয়

ভাষায় তার অনুবাদও হয়েছে। অনুবাদ পড়ে একজন বিদেশিনি লিখেছিলেন—তিন দিন ধরে স্বপ্নে জাগরণে মহুয়া, পালঙ্ক সখী আর হোমরা বেদেকেই দেখেছি!

শিল্পী সাহিত্যিকরা জিপসীকে মর্যাদা দিয়েছেন, ভালোবাসা দিয়েছেন, তাদের সম্পর্কে জনমনে আগ্রহ সঞ্চার করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য এই, জিপসী তবু সাধারণ গৃহস্থ ইউরোপীয়র কাছে এই সেদিনও পুরোপুরি অচেনা। সে যখন বলে—ময় হু কালো,—মাণ্ডে হে দাদেসক্রো ওয়াৎস;—ময় হু সাচো পাসকেরো রোম—তখন সাধারণ মানুষ ভাবে, ওরা নিশ্চয় ইজিপসিয়ান!

জিপসীর কুলজি নির্ণয়ের চেষ্টা শুরু হয়েছিল অবশ্য অনেক আগেই। দূর ১৬৯৭ সনে ওয়েজানসিল নামে একজন পণ্ডিত (J.C. Wagensil) জিপসীর মুখের ভাষা পরখ করে রায় দিয়েছিলেন—এ ভাষা জার্মান ইহুদি চোরদের ভাষা। আর একজন বিশেষজ্ঞ হারভাস (L. Hervas) কিছুকাল পরে অনেক ভেবেচিন্তে জানালেন—জিপসীর ভাষা মূলত ইতালিয়ান।

এমনি ভাবেই চলছিল। তারপর হঠাৎ একদিন আকস্মিকভাবে ধরা পড়ে গেল জিপসীর সঙ্গে 'বরা থান' তথা ভারতের আত্মীয়তার কথা। সেটা ১৭৭৬ সনের কথা। ভিয়েনার একটা কাগজে ছোট্ট একটা খবর বের হল সে বছর। তাতে জানা গেল, ভ্যালি ইস্তভান (Valy Istvan) নামে একজন হাঙ্গেরিয় যাজক নেদারল্যান্ডস্ এ গিয়েছিলেন বিদ্যাচর্চা করতে। সেখানে লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু ভারতীয় ছাত্র ছিল। তারা মালাবার থেকে গিয়েছে। একদিন ওরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে, এমন সময় ইস্তভান সেখানে হাজির। তিনি ওদের ভাষা শুনে অবাক—এ যে হাঙ্গেরিয় জিপসীদের ভাষা! যাজক যত্নের সঙ্গে এদের কাছ থেকে কিছু ভারতীয় শব্দ সংগ্রহ করলেন। তারপর জিপসীদের ব্যবহৃত নানা শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন—দুই ভাষা খুবই কাছাকাছি। প্রায় এক হাজার শব্দ পরখ করেছেন তিনি। সুতরাং, তাঁর মনে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, জিপসীরা ইজিপসিয়ান নয়, মূলত ভারতীয়। ভিয়েনা সংবাদপত্র সে খবরটিই সকলের গোচরে আনতে চায়।

হঠাৎ যেন একটা নতুন দিক খুলে গেল। ১৭৮০ সনে জার্মান ভাষাবিদ্ গ্রেলমান (H.M. Grellman) জিপসী শব্দ নাড়াচাড়া করে জানালেন—হ্যাঁ, সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে বইকি! তিনি আরও বললেন—ভারতের সুরাটে যে ভাষা চালু আছে তার সঙ্গে রোমানির বিলক্ষণ মিল। প্রায় একই সঙ্গে (১৭৭৭) আর এক জার্মান পণ্ডিত রুডিগার (J.C. Rudiger) একই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন—ভারতীয়

ভাষার সঙ্গে রোমানির সাযুজ্য রয়েছে। শোনা যায়, প্রখ্যাত দার্শনিক ইমান্যুয়েল কান্টও (Immanuel Kant) তাঁদের সঙ্গে একমত ছিলেন।

তবে রুডিগারের হাতে বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার পক্ষে যথেষ্ট তথ্য ছিল না। স্বভাবতই সে কাজ শুরু হয় কিছু পরে, উনিশ শতকে। এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন ব্রিটিশ ভাষাতাত্ত্বিক জেকব ব্রায়ান (Jacob Bryan) এবং জার্মান পণ্ডিত পট (A.F. Pott)। বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় বিস্তৃত পর্যালোচনা করে ১৮৪৪ সনে পট জানালেন, ইউরোপের নানা অঞ্চলে প্রচলিত রোমানির মধ্যে পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু এগুলো মূলত এক এবং সংস্কৃতের সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক।

উনিশ শতকে রোমানি ভাষা এ' ৎ রোম-এর সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ নিয়ে আরও অনেক পণ্ডিত মাথা ঘামিয়েছেন। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির আর্ক ডিউক জোসেফ (Archduke Joseph) হাঙ্গেরির জিপসীদের ভাষার একটি ব্যাকরণ প্রকাশ করেছিলেন। তাছাড়া রোমানি ভাষা নিয়ে চর্চা করেছেন পাসপাতি (A.G.Paspati) চেক পণ্ডিত মিকলোইস্ক (R.F.Mikloisch) প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ। পাসপাতি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, 'রোম' বলতে জিপসী বলতে চায় সে রামের অনুচর, কিংবা রামের দেশের মানুষ। মিকলোইস্ক পট-এর গবেষণাকে আরও সম্প্রসারিত করে জানিয়েছিলেন, জিপসীর ভাষায় শুধু ভারতীয় নয়, খুঁজে পাওয়া গেছে স্লাভ, গ্রিক, তুর্কি, আর্মানীয় এবং পারসিক ভাষার শব্দাবলীও। তার সূত্র ধরেই চিহ্নিত করা যেতে পারে জিপসীর ইউরোপ অভিযানের মানচিত্র।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য জিপসী-পাগল জর্জ বরোও (G. Borrow) উনিশ শতকে প্রচলিত এইসব অভিমত গ্রহণ করে ঘোষণা করেছিলেন—জিপসীর ভাণ্ডারে শব্দ আছে হাজার তিনেক, তার বেশির ভাগই মূলত সংস্কৃত কিংবা অন্য কোনও ভারতীয় ভাষাজাত।

বিশ শতকেও ইউরোপীয় জিপসীর ভাষা পণ্ডিতদের অন্যতম আলোচ্য। হাঙ্গেরির সুখ্যাত বিশেষজ্ঞ ডঃ উলিক (Dr. Rude Uhlik) সংগ্রহ করেছেন প্রায় দশ হাজার শব্দ। তাঁর মতে এর মধ্যে শতকরা ষাট ভাগই সংস্কৃতের আত্মীয়। কেম্ব্রিজের পামার সাহেব (E.H. Palmer) চার হাজার শব্দ ঘেঁটে প্রমাণ করেছেন, বেশির ভাগ শব্দই ভারতীয় অথবা পারসিক; গ্রিক বা ইউরোপীয় শব্দ যৎসামান্য। উলনার সাহেব (A.C. Woolner) দেখাতে চেয়েছেন (১৯১৫) জিপসীদের ভাষার আদি জন্মস্থান—'মধ্য ভারত'। তাছাড়া রয়েছেন—জুল ব্লক (Jule Block), মার্টিন ব্লক (Martin Block) প্রমুখ পণ্ডিত। জিপসীতত্ত্বকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁরা। প্রখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত টার্নার সাহেব (R.L. Turner) Jule Black ১৯২৭

সনে ইন্দো-আর্য ভাষায় রোমানির স্থান নির্দেশ করে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, ভারতের আগন্তুকরা ইউরোপে যাত্রার আগে সুদীর্ঘ কাল কাটিয়েছে আফগানিস্তানে।

বস্তুত আলোচনা এখনও চলছে। তবে আলোচ্য বিষয় এখন আর জিপসীর আদিভূমি কোথায়, কিংবা রোমানি ভাষার জননী কে, তা নয়—সবাই একবাক্যে মেনে নিয়েছেন, জিপসী ভারতের সন্তান। আজকের আলোচ্য, তারা ভারতের ঠিক কোন অঞ্চল থেকে ইউরোপযাত্রী হয়েছিল, কিংবা কোন্ ভারতীয় জনগোষ্ঠীর অংশ তারা, মুখ্যত তা-ই। সুখের বিষয়, এই আলোচনায় আজ এগিয়ে যাচ্ছেন জিপসী এবং ভারতীয় বিদ্যোৎসাহীরাও। ডঃ কোচানোউস্কির (Dr. Van Kochanowski) কথা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন জিপসী ভাষাতত্ত্ববিদ। পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে এই বালটিক জিপসী হেসে বলেন—ময় রোমানিলোগ। এই প্রসিদ্ধ গবেষক সর্বন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। বেশ কয়েক বছর তিনি এদেশে গবেষণা করেছেন। তাঁর বই প্রকাশিত হয়েছে দিল্লি থেকে। তিনি নিজেকে বলেন —চৌহান রাজপুত। ভারতে জিপসীর আদি ঠিকানা খুঁজতে তিনি ব্যস্ত। সম্প্রতি ডঃ ঋষি (W.R. Rishi) নামে একজন ভারতীয় গবেষকও এ বিষয়ে মনোযোগী হয়েছেন। দু হাজার শব্দের নানা ভাষার প্রতিশব্দ নিয়ে তাঁর অভিধান প্রকাশিত হচ্ছে লন্ডনের ইনস্টিটিউট অব রোমানি রিসার্চ অ্যান্ড ডকুমেন্টসন থেকে। জিপসীরা ভারতের কোথাকার লোক সে সম্পর্কে এঁদের মতামত যথাস্থানে শোনা যাবে। তার আগে ইউরোপের দেশে দেশে ভ্রাম্যমাণ কালো ওই সাচ্চা মানুষের কথা কিছু কান পেতে শোনা যাক :

রোমানি শব্দ	**ভারতীয় ভাষায় অর্থ**
আবছিন (abchin)	চুরি করা
আকানা (akana)	এখন
আখোর (Akhor)	বাদাম
আনভ (anava)	আন, আনা
অন্দ্রে (andre)	ভেতরে, অন্দরে
অঙ্গুষ্ঠ (angust)	অঙ্গুলি, আঙুল
অঙ্গুস্ত্রি (angustri)	অঙ্গুরীয়, আংটি
আনরো (anro)	আন্ড, ডিম
আকুইয়া (aquia)	আঁখি, চোখ
বাৎজে (bahtze)	বাগ, বাগান
বাল (bal)	চুল

রোমানি শব্দ	ভারতীয় ভাষায় অর্থ
বান্ধাব (bandava)	বন্ধন করা, বাঁধা
বাকরো (bakro)	বকরি, ছাগল
বারো (baro)	বড়
বেসাব (beshava)	বাসা, বাস করা
বিস্টো (bisto)	বসা
বিয়াভ (biav)	বিবাহ, বিয়ে
বুকালো (bokalo)	ভুখা, ক্ষিধে পাওয়া
বৃসুন্দো (brisundo)	বৃষ্টি
বুকে (buke)	ঘেউ ঘেউ করা
কাল্লিকাস্তে (callicaste)	গতকাল
কাস্তে (caste)	হাতুড়ি (কাস্তে নয়)
চাম (cham)	চুমু
চর (char)	মাঠে চরে বেড়ানো, ঘাস খাওয়া
ছাও (chao)	ছেলে
চিপ (chip)	জিভ
চিরিকলো (Chirikalo)	চিড়িয়া, পাখি
চন (chon)	চাঁদ, মাস
চোরি (chori)	ছুরি
চুচে (chuche)	স্তন
চুরনো (churno)	চোর
ক্রিমেন (cremen)	ক্রিমি, পোকা
দাই (dai)	মা
দাল (dal)	দরজা
দান্ত (dant)	দাঁত
ডার (dar)	ভয়
দেবেল (debel)	দেবতা
দিয়ার (diar)	দেখা
দিনো (dino)	দেওয়া
দুয়া (dua)	দুঃখ, ব্যথা
দুখ (duk)	ওই

রোমানি শব্দ	ভারতীয় ভাষায় অর্থ
দুর (dur)	দূরবর্তী
একেতানে (eketone)	একসঙ্গে
এনরে (enre)	ভেতরে, অন্দরে
এসতুচে (estuche)	অস্ত্র, তলোয়ার
ফেলে (fele)	ফেলে দেওয়া
ফুরো (furo)	বুড়ো
গাও (gao)	গ্রাম
ঘেলাভা (ghelava)	খেলা করা, গান গাওয়া
ঘেলিয়ম (gheliom)	গেল, চলে গেল
ঘেনাভা (ghenava)	গোনা, গণনা করা
ঘিবেস (ghives)	দিবস, দিন
গিভ (giv)	গম
গুরুভ (guruv)	গোরু
হাস (has)	কাশি, (হাসি নয়)
জামুত্রো (jamutro)	জামাই
জানভ (janava)	জানা
জিভন (jivana)	বেঁচে থাকা
জোরো (joro)	শির, মাথা
জুকো (juco)	শুকনো
কা (ka)	কে, কোন্‌টি
কালো (kalo)	কালো, কৃষ্ণকায়
কান (kann)	কান
কান্না (kanna)	কখন
কেলাভা (kelava)	খেলা করা, গান গাওয়া
কেতি (keti)	কতখানি
খার (khar)	খাদ, গর্ত
খাভ (khava)	খাওয়া
কিনাভ (kinava)	কেনা
লাছানো (lachano)	লজ্জাকর, লজ্জিত
লাজাভ (lajava)	লজ্জিত

রোমান শব্দ	ভারতীয় ভাষায় অর্থ
টাকরানি (takrani)	রানি
তান (tan)	স্থান
তাপরভ (taparava)	তাপ দেওয়া
তারশুল (tarshul)	ক্রুশ, ত্রিশূল
তেরনো (terno)	তরুণ
তুত (tut)	দুধ
উছো (ucho)	উঁচু, লম্বা
ভারিয়া (varia)	ভারী, ওজন
ভাস্ত (vast)	হস্ত, হাত
ভুস্ত (vust)	ওষ্ঠ, ঠোঁট
ইয়াক (yak)	আগুন
আক (yak)	আঁখি, চোখ
জোরালো (zoralo)	জোরালো, মজবুত ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই শব্দগুলো এ জি পাসপাতির তৈরি তালিকা থেকে সংগৃহীত। ডঃ উলিব এর ভাণ্ডার থেকে আরও কিছু রোমানি শব্দ :

রোমান	ভারতীয়
সিঙ্গারা (singhara)	সিঙ্গারা (জলজ ফল বিশেষ)
বিয়া (biyah)	বিয়া, বিবাহ
ফেন (phen)	বহিন, বোন
ভুক (bhukh)	ভুখ, ক্ষুধা
চিরি (chiri)	চিরি, চড়ুই পাখি
কাক (kak)	কাকা, খুড়ো
বিবি (bibi)	বিবি, মাসিপিসি
কাস্‌ট (kasht)	কাষ্ঠ, কাঠ
পানি (pani)	পানি, জল
জিব্ (jibh)	জিভ, জিহ্বা
দোজাভ (dojav)	দরিয়া, বড় নদী, সমুদ্র
চুন (chun)	চাঁদ
শাক (shak)	শাক, সবজি
ছেহ্ (chheh)	মেয়ে

রোমানি	ভারতীয়
দান্ত (dant)	দাঁত
দেবতা (devata)	দেবতা
সাপ (sap)	সাপ
গুরুভ (guruv)	গোরু
আমারো (amaro)	আমার
বারো (baro)	বড়
মাঙ্গভ (mangava)	মাগা, চেয়ে নেওয়া
লোন (lon)	নুন, লবণ
কাম (kam)	ঘাম, গরম
কামেভ (kameva)	কাম, ভালোবাসা
সূন (shoon)	সূর্য ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবার শোনা যাক ডঃ উলিকের কিছু রোমানি বাক্যের নমুনা :

কই তেরো কের (kai tero ker)— তোমার ঘর কোথায়?

কই সি থে চুরি (kai si the churi) — ছুরিটা কোথায়?

সূন তু দায়া — (shoon tu daya)— তুমি কি শুনতে পাচ্ছ মা?

মেরো কের ইনডিয়া (Mero ker India) —আমার দেশ ভারত।

সূন পল (shoon pal)— শোন ভাই।

মাই শিরো ডুখেরস (My sero dukkers) —আমার মাথা ব্যথা করছে।

নর মেন ছিওর (Nor men choir) —আমাদের কোনও মেয়ে নেই।

নেভি তুদ ফ্রম দি গুভেনি (Nevi tud from the guveni) —গোরুর নতুন দুধ।

সার সিন (Sar sin)— কেমন আছ?

সার সিন মেরো রাই (Sar sin meero rai)—কেমন আছেন মশাই?

এ ইয়োক্কি জুভা এ ইয়োক্কি (A yokki juva a yokki)—হাত দেখতে পটু মেয়েছেলে।

শি ডুকেরস, পারলা, শি ডুকেরস (she dukkers, pala, she dukkers)—সে হাত দেখে ভাই, সে হাত দেখে। ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, ইউরোপের জিপসী যখন তাদের শিবিরে আগুনের পাশে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলে, তখন কোনও সাধারণ ভারতীয় হয়তো আজ চট করে তাদের কথা বুঝে উঠতে পারবেন না। কেননা, দেশে দেশে কুড়িয়ে

বেড়াতে বেড়াতে তাদের শব্দ ভাণ্ডারে নানা দেশের শব্দরাজিই কেবল স্থান করে নেয়নি, তাদের বাকভঙ্গি এবং উচ্চারণেও আজ বিশ্বের নানা অঞ্চলের ছাপ। তাছাড়া গত দুই দশক তারা মোটামুটি কোনও না কোনও দেশের জাতীয় সীমায় বন্দি। আধুনিক পৃথিবীতে জিপসী আর সেদিনের মতো যথার্থ ভবঘুরে নয়। ফলে তাদের চেহারায়, পোশাকে এবং ভাষায় সেসব দেশের জাতীয় ছাপও ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাহলেও ইউরোপীয় জিপসীর ভাষায় এখনও এমন অনেক শব্দ খুঁজে পাওয়া যায়, সাধারণ ভারতীয় শ্রোতার কাছেও যার ভারতীয় সৌরভ ধরা পড়তে বাধ্য। স্কটল্যান্ডের গাঁয়ের পথে যেতে যেতে যদি কোনও ভারতীয় কোনও সন্ধ্যায় হঠাৎ থমকে দাঁড়ান তাহলে তিনি শুনতে পাবেন জিপসী-মা ছেলে কোলে ঘুমপাড়ানি গান গাইছে :

দিক আকাই, দিদাকাই
দ্রাদ্রুস গন্ টু পুভ দি গ্রোই
অফ দি ড্রোম অ্যান্ড ইন টু দি তান্
ফাইভ ও ক্লক অব দি রার্তি।

এ ছাড়ার মানে—এদিকে দেখ, জিপসীর ছেলে, তোমার বাবা গেছে রাস্তার ওপারের জমিতে ঘোড়া চরাতে—রাত তখন পাঁচটা! 'দিক' মানে— দেখ, 'আকাই'—এদিকে, এখানে; 'গ্রোই'—ঘোড়া, 'রার্তি'—রাত।

ব্রিটেনের জিপসীদের মুখে এখনও হামেশা যে সব শব্দ শোনা যায় তার থেকে কয়েকটি তুলে দিচ্ছি :

আদ্রে (adray)—ওখানে
আকাই (akai)—এখানে
আপ্রে (apray)—ওপরে
আরভা (arva)—হ্যাঁ
আ তুত (a toot)—ওপারে
বিবি (bibi)—মাসি, পিসি
বিকেন (bicken)—বিক্রি করা
বোড়ি (bori)—বড়
বোড়ি লোন পানি (bori lon pani)—সমুদ্র
বোস্ (bosh)—বেহালা
ছিন (chin)—কাটা
চুরি (churi)—ছুরি
দাদ্রুস (dadrus)—বাবা
দাই (dai)—মা
দেল—(del)— দেওয়া
দিকের গ্লিম)(dikker glim)–আয়না।
দিভুস (divvus)—দিন
ডুনিক (dunnik)—গোরু
গাও (gav)—শহর
গোর্গি, গোর্গিস (gorgie, gorgies)—যারা জিপসী নয়
বেস (bes)—বস
গোরি (gori)—ঘোড়া

চিরিকলো (chiriklo)—পাখি
চোর (chor)—চুরি করা
জিন (jin)—জানা, বোঝা
জিভাবেন (jivaben)—জীবন
জুকল (jukal)—কুকুর
কাকো (kako)—কাকা, খুড়ো
লেল (Lel)—লওয়া
লিল (lil)—বই
লোলি (loli)—লাল
লোন (lon)—লবণ
মান্ডি (mandi)—আমি, আমাকে
মাছকি (meski)—চা
মূই (mooi)—মুখ
মূস (moosh)—মানুষ
মুল্লের (muller)—মরা ইত্যাদি।
জাউল (jaul)—যাও
জিব (jib)—কথা, ভাষা
পান্নি গরনি (panni gurni)—ব্যাঙ
বেস (bes)—বস
জুভল (juval)—স্ত্রীলোক
তুভালো (toovalo)—তামাক
পুটসি (pootsi)—পকেট
রার্‌তি (rarti)—সন্ধ্যা, রাত্রি
রোম (rom)—মানুষ
তূত (toot)—তুমি
তূলি (tooli)—তলায়
তোবার্‌তি (tobarti)—আজ রাত্রে
পান্নি (panni)—জল
ইয়োগ (yog)—আগুন।

প্রসঙ্গত একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জিপসীরা যেমন নানা দেশের শব্দ কুড়িয়ে নিয়েছে, ইউরোপের নানা ভাষায় কিছু কিছু নিজস্ব শব্দ তেমনি তারা দানও করেছে। বিশেষতঃ—অপরাধ জগতের ভাষায় অবশ্যই। ইংরেজি 'স্ল্যাং' (slang) শব্দটিই নাকি মূলত ভারতীয়, 'সঙ্‌' থেকে জাত। তাছাড়া ইংরেজি ভাষায় যে সব জিপসী শব্দ অনুপ্রবেশ করেছে, তার তালিকা রীতিমতো দীর্ঘ। নমুনা হিসাবে কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে

জিপসী	ইংরেজি
ব্যামবুজল (Bamboozle)—চকচকিয়ে দেওয়া	ব্যামবুজল (Bamboozle)—ফাঁকি দেওয়া, প্রতারণা করা
বস (Bosh)—বাজে কথা	বস (Bosh)— নির্বুদ্ধিতা, বোকামি
চিজ (cheese)—বস্তু, জিনিস	চিজ (cheese)—প্রথম শ্রেণির জিনিস
চিভে (chive)—জিভ	চিভে (chive)—চেঁচান
দাদে (Dade)—বাবা	ড্যাডি (Daddy)—বাবা
ইসচুর (Ischur)— চোর	চুর (Cur)—নীচ প্রকৃতির লোক, অসৎ
ল্যাব (Lab)—শব্দ	

জিপসী	ইংরেজি
মামি (Mami)—ঠাকুমা	লবস (Lobs)—শব্দাবলি
মাঙ (Mang)—ভিক্ষে করা	মামি (Mummy)—মা
মর্ট (Mort)—স্বাধীন স্ত্রীলোক	মাউন্ড (Maund)—ভিক্ষে করা
পল (Pol)—ভাই	মট (Mot)—বারবনিতা
রোমি (Romee)—স্ত্রীলোক	পল (Pal)—সঙ্গী, আত্মীয়
	রামি (Rummy)—ভালো মেয়ে বা মহিলা ইত্যাদি

ঠিক এমনিভাবে স্প্যানিশ এবং ফরাসি ভাষায়ও অনেক জিপসী শব্দ ঢুকে গেছে। একজন ফরাসি ভাষাতত্ত্ববিদের মতে প্রচলিত ফরাসি ভাষায় এমন কুড়ি থেকে তিরিশটি শব্দ খুঁজে পাওয়া যাবে, যা মূলত রোমানি।

জিপসীর হাতে কোনও হরফ বা অক্ষর নেই। একজন পণ্ডিত অবশ্য জিপসী অক্ষরমালা প্রকাশ করেছিলেন। তাতে সাকুল্যে তেইশটি বর্ণ ছিল। কিন্তু সেগুলো এক ধরনের চিত্রাক্ষর মাত্র। জিপসী তা ব্যবহার করে বলে শোনা যায় না। তবে ইউরোপের অপরাধ জগত নাকি ওদের কিছু কিছু সাংকেতিক চিহ্নের সঙ্গে সুপরিচিত ছিল। এক একটি চিহ্নের এক এক অর্থ। জিপসীরা বাড়ির দেওয়ালে বা রাস্তায় অন্য জিপসীদের জন্য তা এঁকে রেখে যেত। সেগুলোকে বলে প্যাট্রিন (Patrin)। একটিতে হয়তো বলা হয়েছে : এ বাড়ির লোকেরা কিছুই দেয় না; আর একটিতে—এরা উদার প্রকৃতির লোক, বদান্য। তেমনি সংকেতে আরও নানা সংবাদ : এরা জিপসীকে চোর বলে মনে করে; এ বাড়িতে আমরা ইতিমধ্যে চুরি করেছি; এ বাড়ির গিন্নি কোলে ছেলে চায়; এ বাড়ির বউ আর ছেলেপুলে চায় না; মালিক মারা গেছে; এ বাড়ির কর্তা মেয়ে দেখলে বেসামাল হয়ে ওঠে ইত্যাদি।

এজাতীয় সাংকেতিক চিহ্ন প্রায় সব দেশের ভবঘুরেই ব্যবহার করে। এসব দৈনন্দিন জীবনের ভাষা নয়। আমরা বরং জিপসীর ব্যবহারিক ভাষার কথায়ই আবার ফিরে যাই।

জিপসীর ভাষায় বিশেষভাবে লক্ষণীয় সংখ্যাবাচক শব্দগুলো। ওদের মুখে ১—ইয়েক (yek), ২—দুই (dui), তিন—ত্রিন (trin), ৪—স্টাই (staw), ৫—পানস্ (pansh), ৬—সেক্ (shek), ৭—এফটা (efta), ৮—অক্ট (okta) ৯—নিনিয়া (niniya), ১০—দেশ (desh), ১১—য়েজদেন (ezden), ১২— দাউজ (dowz), ১৩— ত্রেশ (tress), ১৪—কাতাউজ (katawz), ১৫—কউনিজ

(kwinz), ১৬—দাইজি (daizi), ১৭— দে তো হেফ (deh to hef), ১৮— দেশকো (deshko), ১৯—নিনিয় (ninya), ২০—বিজ (biz)।

কোনও কোনও এলাকায় জিপসী নাকি দশ অবধি গণনা করে। এগার এলে সে বলে—'দাশ্ তো এক' এবং এই ভাবে এগিয়ে যায়। কুড়ি তার কাছে — দো বার দাশ, পঞ্চাশ—'পাঞ্চ বার দাশ'। কিন্তু জিপসী লোর সোসাইটি প্রকাশিত আমি যে তালিকাটি থেকে ওদের শব্দগুলো উদ্ধৃত করেছি সেখানে দেখতে পাচ্ছি গণনা পদ্ধতি একটু অন্য রকম ৩০—ত্রিনদা (trinda), ৪০—আসতাউরি (astawri), ৫০—পাসেরদি (pasherdi), ৬০— সেকেরদি (shekerdi), ৭০—এফতাদি (eftadi), ৮০—অক্তাদি (oktadi), ৯০—নিনিয়াদি (ninyadi), ১০০—শেল (shell), ২০০—দুই শেল (dui shel) ৯৯৯—নিনিয়া শেল নিনিয়াদি তা নিনিয়া (ninya shel ninyadi ta ninya)।

ভাষা প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আরও কিছু খবর। জিপসীর কাছে বাইবেল যেমন—শাস্ত্র, পাদ্রি—ঋষি, ক্রুশ—ত্রিশূল, ঠিক তেমনি 'বড়া পানি' তার কাছে সমুদ্র, তাতো পানি, ব্রান্ডি, আর বড়া গাঁও—লন্ডন শহর। ব্রিটেনের শহরগুলোকে নাকি জিপসী নিজের পছন্দমতো নাম দিয়ে দিয়েছে। তার কাছে লিভারপুল বউরি বেরেসতা গাও (Bauri beresta gav)। কেননা সেটি বড় বড় জাহাজের শহর। লিভারপুল ছুরি কাঁচির শহর, সুতরাং—চুরি এসতাগাও (churi esta gav); ইয়র্কশায়ার ধোঁয়ায় কালো, সুতরাং—কাউলি তেম (kauli team); দক্ষিণ ল্যাংকাসায়ার ফুলের দেশ, সুতরাং সেটা—রুসমি তেম (Rusmi tem)। এই তেম অন্যত্র তান বা স্থান। যেমন —বড়া তান। ভিক্ষু চমনলাল বলেন—বড়া তান অর্থ বিশাল দেশ—ভারত।

এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে জিপসী আবার অনেকগুলো প্রশ্ন নিয়ে এসে দাঁড়াল বিশ্বজনের সামনে। ওরা যদি ভারতীয়ই, তবে কোথা থেকে এল ইজিপ্টের ওই কাহিনিমালা? আর কেনই বা ওরা রটিয়েছিল সে সব গল্প?

রহস্যময়ী জিপসী এবারও রহস্যের হাসি হাসল। আড়ি পেতে জানা গেল তাদের সান্ধ্য আড্ডায়, মিশরীয় উপাখানগুলোকে বলা হয় 'গ্রেট' ট্রিক'—বৃহৎ ধাপ্পা। ওরা আদৌ কখনও পোপের কাছেও যায়নি।

ইউরোপের জিপসী দলবদ্ধভাবে একবার পোপকে দর্শন করতে গিয়েছিল বটে, কিন্তু সে ১৪২২ সনে নয়, তার পাঁচশো চল্লিশ বছর পরে—১৯৬৫ সনে। সেদিন সেপ্টেম্বরের ২৬ তারিখ। দুহাজার জিপসী সমবেত হয়েছিল ভ্যাটিকানে-এ। পোপ ষষ্ঠ পল তাদের স্বাগত জানিয়েছিলেন প্রিয়তম ভবঘুরেরা সম্বোধনে। তাদের আশীর্বাদ জানিয়ে তিনি বলেছিলেন—তোমরা চিরকালের তীর্থযাত্রী। জিপসীরা মনের খুশীতে সেদিন ভ্যাটিকান প্রাঙ্গণে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছিল। নাচে গানে জমজমাট সে আসর।

অনেকে মনে করেন, লিট্‌ল ইজিপ্টের ডিউক পোপের যে শিলমোহর ইউরোপীয় দরবারে পেশ করেছিল, সেগুলো জাল দলিল নাও হতে পারে। পোপের মহাফেজখানা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও অবশ্য তার স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে ভ্যাটিকান কর্তৃপক্ষ মনে করেন, এর জন্য এদের প্রতারক আখ্যা দেওয়া ঠিক হবে না, অনেক পুরনো নথিপত্র তাঁদের নষ্টও হয়ে গেছে।

সে যাই হোক, ভাষার সূত্রটি হাতে আসার পর তাই ধরে গবেষকরা এবার ধীর পায়ে এগিয়ে চললেন গোলকধাঁধার কেন্দ্রের দিকে। এতকাল তাঁরা কী কাণ্ডই না করেছেন। কেউ বলেছেন—এরা এসেছে নুবিয়া থেকে। কেউ বলেছেন—ওরা ফিনিসীয়। কারও মতে ওরাই আদি মিশরীয়। ভলতেয়ার নাকি বলেছিলেন—জিপসীরা আসলে মিশরের পতিত পুরোহিত আর মন্দির কন্যাদের অবৈধ সংসর্গের ফসল। আর একজন গবেষক জানিয়েছিলেন, ওরা আসলে সিসিলির আদিবাসী। আর একদল অনেক ভেবেচিন্তে ঘোষণা করেছিলেন—প্রবাদ নগরী অ্যাটলানটিস

হঠাৎ সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার পর বুদবুদের সঙ্গে কিছু মানুষ ভেসে উঠেছিল। তারাই আজ জিপসী। রাজা জেমস্ এর দরবারী লেখক বেন জনসন ১৬২১ সনে এক পুঁথি লিখে প্রচার করেছিলেন—জিপসী অসলে ক্লিওপেট্রা আর টোলেমির বংশধর। ইংরাজ রাজ খুশি হয়ে নাকি তাঁর ভাতা দ্বিগুণ করে দিয়েছিলেন।

এবার ঝোপের এদিকে ওদিকে পিটিয়ে বেড়াবার সম্ভাবনা অনেক কমে গেল। কেননা, হাতে রয়েছে ভাষার চাবিকাঠি। নতুন আলোকে পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটেই গবেষকরা এবার জানালেন—ইজিপ্ট মানে মিশর নয়; প্রাচ্য নিকট প্রাচ্য। জিপসীরা জার্মানির পথে মধ্য এবং পশ্চিম ইউরোপে অভিযাত্রী হয়েছিল। জার্মানিতে তৎকালে লিটল ইজিপ্ট বলতে নিকট প্রাচ্যকেই বোঝাত। তাছাড়া, জিপসীদের আনাগোনা শুরু হওয়ার আগেও, অপরিচিত যে কোনও ভবঘুরেকেই নাকি সেখানে বলা হতো—ইজিপসিয়ান। আপন পরিচয় ভুলে যাওয়া অসহায় ভারতীয় আগন্তুকরা সে তক্‌মাটাই কুড়িয়ে নিয়েছিল মাত্র। কারও মনে যাতে কোনও সংশয় দেখা না দেয়, সে কারণেই তারা মিশরত্যাগ সম্পর্কে নানা গল্প ফেঁদেছিল। সে সব গল্পে তারা বাইবেল এবং খ্রিস্টকে জড়িয়ে নিয়েছিল কারণ, তারা জনত, এবার যে জগতে তারা অবতীর্ণ হয়েছে, সেখানে ওই নামগুলোর বিশেষ মাহাত্ম্য। এখানে বেঁচে থাকতে হলে, যে ভূমিকাতেই হোক না কেন, খ্রিস্টীয় ধ্যানলোকে একটু ঠাঁই করে নেওয়া চাই। যারা আপন অতীত খুইয়ে বসে আছে, তাদের পক্ষে এ ধরনের বাসনা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ভারতকে ভুলে অতএব ওরা তখনকার মতো 'ফারাওয়ের লোক' হয়ে গিয়েছিল। তবে বার বার ওরা বলে গেছে—নাই বা থাক আমাদের কোনও পরিচয়, আমরা মানুষ, আমরা 'রোম'।

কবে ওরা ভারত থেকে পশ্চিমের দিকে পা বাড়িয়েছিল, কী ভাবে, কোন, পথে ওরা আজকের ঠিকানায় পৌঁছেছিল, ওদের ভাষা ক্রমে তাও প্রকাশ করে দিল। সে যুগপৎ এক রোমাঞ্চকর এবং হৃদয়বিদারক কাহিনি। সংক্ষেপে তাদের যাত্রাপথটি মোটামুটি এই :

কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের মতে যাত্রা শুরু হয়েছিল খ্রিস্টীয় এক হাজার অব্দে। কারও কারও মতে তারও আগে। সিন্ধু উপত্যকা থেকে হাজার হাজার মানুষ পশ্চিমের পথ ধরল। ভারত সীমান্ত পার হয়ে প্রথমে আফগানিস্তান এবং পারস্যে। সেখানে এক দল ভেঙে তিন হয়ে গেল। অবশ্য এমনও হতে পারে সবাই একসঙ্গে ঘর ছাড়েনি। ওরা নানা সময়ে স্বতন্ত্র পথিক। যা হোক, সেখান থেকে একদল চলে গেল কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরে, অন্য দল পারস্য

উপসাগরের দক্ষিণে। উত্তরের দলটি চলে গেল টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস এর ধারে। সেখানে গিয়ে দল আবার ভেঙে গেল। একদল চলল কৃষ্ণসাগরের দিকে, আর একদল সিরিয়া অভিমুখে। এগুলোকে উপদল বলাই ভালো। কেননা, দলের প্রধান অংশ তখন চলেছে এশীয় তুরস্কের হৃদয়ের দিকে। দক্ষিণ যাত্রীদের একটি শাখা এগিয়ে গেল প্যালেসটাইন এবং মিশরের মধ্য দিয়ে ভূমধ্য সাগরের তীর ধরে। সম্ভবত এদেরই একাংশ আফ্রিকার উত্তর উপকূল ধরে পৌঁছেছিল জিব্রালটর প্রণালীতে সেখান থেকে অবশেষে স্পেনে। আগেই বলা হয়েছে তারাই গিতানোস স্পেনের অন্যতম জিপসী সম্প্রদায়। প্রধান গোষ্ঠী যেটি তুরস্কে ছিল, সেটি বসফরাস পেরিয়ে পা রাখল গ্রিসে। তারপর ছড়িয়ে পড়ল বিস্তীর্ণ বলকান অঞ্চলে। সেখান থেকে ক্রমে মধ্য ইউরোপে। তারপর আরও পশ্চিমে—দূর ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে। স্ক্যান্ডেনেভিয়ার দেশগুলোতে জিপসীর পদসঞ্চার ঘটেছে, অনেকে মনে করেন, রাশিয়া থেকে।

লক্ষণীয় জিপসীর এই পথের মানচিত্রে জলপথ প্রায় অনুপস্থিত। যাত্রী হিসাবে হয় সে পদাতিক, না হয় অশ্বারোহী। তার পথ তাই যতদূর সম্ভব সমুদ্রকে এড়িয়ে। ফলে জল সম্পর্কে জিপসীর মনে নানা সংস্কার। জল একদিকে যেমন তার কাছে পবিত্র, অন্যদিকে কালাপানির চিন্তা তেমনই ভয়াবহ। ইউরোপের কোনও কোনও জিপসী সম্প্রদায় বহমান নদীকেও ব্যবহার করে খণ্ড খণ্ড জলাশয় হিসাবে। সে যে ঘাট থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করবে, সেঘাটে কাপড় কাচবে না, বা বাসন ধোবে না। এক ঘাট থেকে সে ঘোড়ার পানি সংগ্রহ করে, অন্য ঘাটে গৃহস্থলির জন্য প্রয়োজনীয় জল।

আর সমুদ্র? জিপসী কাপুরুষ নয়। কিন্তু সমুদ্র ব্যাপারে সে যেন জলাতঙ্কের রোগী। তার চোখে সমুদ্র সব সময়ই ক্রুদ্ধ। একটি জিপসী গানে বলা হয়েছে : ওই শোনো জলের গর্জন, বিপুল সমুদ্র রাগে ফুঁসছে। চিরকাল সে এমনি ক্রুদ্ধ কেননা সে আরও দূরে যেতে পারছে না। নিঃসঙ্গ সমুদ্র তাই কেবল গর্জন করে।

জিপসী উপকথায়ও ফুটে উঠেছে সাগর সম্পর্কে তার ভয়। একটি গল্পে এক জিপসীর কথা বলা হয়েছে। সে ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হয়েছে এক গোলাবাড়িতে। বাড়ির মালিককে সে বলল—আমাকে খেতে দাও। লোকটি উত্তর দিল—দিতে পারি, তবে আমাকে গল্প শোনাতে হবে। জিপসী বলল—আমি গল্প জানি না। লোকটা তখন বলল—তবে আমার ওই নৌকোটা জলে ভাসিয়ে দাও। নৌকো দরিয়ায় ভাসাতে গিয়ে জিপসী পড়ল বিপাকে। চারদিক ঘিরে জল। ঢেউ তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে

লাগল। কিন্তু কেউ এল না। জল থেকে তখন উঠে এল এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যা। সে নৌকো সামাল দিল। ওরা দুজনে তখন ভাসতে ভাসতে একটি দ্বীপে গিয়ে ঠেকল। সেখনে কেউ নেই। ওরা দুজনে মিলে ঘর বাঁধল। একজনের বয়স তখন পনেরো, অন্যজনের চোদ্দো। ওদের অনেক ছেলেপুলে হলো। দিব্যি সুখে দিন কাটছিল। হঠাৎ মেয়েটির নজরে পড়ল, নৌকোটা ঘাটেই বাঁধা রয়েছে। সে তাতে চড়তে গেল। জিপসী চেঁচিয়ে উঠল—খবরদার, জলে যেয়ো না। কিন্তু তার আগেই নৌকো তার বউকে নিয়ে ভেসে চলল। বাধ্য হয়ে সেও লাফিয়ে উঠে পড়ল। নৌকো ওদের নিয়ে ফিরে এল সেই গোলাবাড়িতে। ডাঙায় নামা মাত্র দেখা গেল মেয়েটি উধাও, আর জিপসী বুড়ো হয়ে গেছে!

জিপসী তরুণ অতএব ইউরোপের নদীর ধারে দাঁড়িয়ে গান গায় :

নদীতে প্রচণ্ড স্রোত
আমি এ-নদী পার হতে পারব না।
তাহলে নদী আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে,
আমি তা হলে বাঁচব না।
আর,
আমি যদি মরে যাই
তাহলে হে আমার প্রিয়তমা
তোমাকে আমি আর দেখতে পাব না। ইত্যাদি।

প্রধানত স্থলপথ বলেই পরিব্রাজক জিপসীর চলার পথটি এমন আঁকাবাঁকা। তবে পথের ওই রূপরেখাটিকে সম্পূর্ণ নির্ভুল বা চূড়ান্ত বলে মনে করা ঠিক নয়। এ মানচিত্রে এখনও অনেক প্রশ্নচিহ্ন রয়ে গেছে। হয়তো চিরকালই থাকবে। তাছাড়া পথে কোথায় কতকাল কাটিয়েছিল ওরা, সেটা সটিক ভাবে নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। তবে এ তথ্য সবাই মানেন যে, ওরা যখন ইউরোপে পৌঁছেছে তখন ওদের পোশাকে, চেহারায়, ভাষায় এবং আচারে কমপক্ষে পাঁচশো বছরের পথের ধুলো। ইচ্ছে করলেই যেমন সব ঝেড়ে ফেলা যায় না, তেমনি জিপসীর বহুবর্ণ প্রতিকৃতিটিতে কোন দেশের রং কতখানি চট করে তা বলা শক্ত। পথে যত দেশ পড়েছে সর্বত্রই এখনও কিছু না কিছু জিপসী রয়েছে। এক এক দেশে ওদের এক এক নাম বটে, কিন্তু সর্বত্রই ওরা নিজেদের বলে রোম, কিংবা 'মানুষ' অথবা--- কালো'। 'কালো' এবং 'মানুষ' দুটি শব্দই ভারতীয়। বোধহয় 'রোম' শব্দটিও।

আধুনিক গবেষকরা জিপসীকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে চিহ্নিত করেছেন। জান য়ূরস (Jan Yoors) বলেন—ইউরোপের সমুদয় জিপসীকে ভাগ করা যায় চার ভাগে :

(ক) লোওয়ারা (Lowara), (খ) সুরারা (Tshurara) (গ) ম্যাচভায়া (match-vyaya) এবং (ঘ) কালডেরাস (Kalderash)। প্রথম দুই গোষ্ঠী ঘোড়ার কারবারী বাস করে ছাউনি দেওয়া গাড়িতে। দ্বিতীয় গোষ্ঠী কারিগর এবং মিস্ত্রি; তাদের বাস তাঁবুতে।

এই ভাগাভাগিটা একটু মোটা ধরনের। জিপসী তা মেনে নিতে রাজি হবে না। বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ির মতে তাদের মধ্যে নানা দল ও উপদল। আর একজন লেখক ক্লেবেয়ার (Jean Paul Clebert) সাচ্চা জিপসীদের ভাগ করেছেন তিন ভাগে (ক) কালডেরেস (Kalderesh), (খ) গিতানোস (Gitanos), এবং (গ) মানুষ (Manush)।

কালডেরাসরা মিস্ত্রি। তারা মনে করে, বিশুদ্ধ জিপসী-রক্ত তাদের ধমনীতেই প্রবাহিত। তাদের মেল বন্ধন আবার কয়টি উপগোষ্ঠীকে নিয়ে। তাদের মধ্যে আছে লোভারি (Lovari), বয়াস (Boyahas) লুরি (Luri), সোরারি (Tshorari), এবং তুর্কো আমেরিকানরা (Turco American)। শেষোক্ত দলের এই নামকরণ করা হয়েছে কারণ তারা তুরস্ক থেকে আমেরিকায় গিয়েছিল। তারপর সেখান থেকে ফিরে আসে ইউরোপে।

স্পেনের বাইরে 'গিতানোস'দের দেখা মেলে দক্ষিণ ফ্রান্সে, পর্তুগাল এবং উত্তর আফ্রিকায়। 'মানুষ' জিপসী প্রায় সব দেশেই রয়েছে। তাদের আর এক নাম 'সিন্তি' (Sinti)। দেশভেদে অবশ্য তাদের নামভেদ ঘটেছে। কিন্তু কালডেরাস এক নজর তাকিয়েই বলে দেবে—ওরা 'গিতানো' না 'সিন্তি'। এছাড়া আয়ার্ল্যান্ডে রয়েছে 'টিংকার'রা (Tinkers)। তারাও মিস্ত্রি। কখনও কখনও ঘোড়ার ব্যাপারীও বটে। তাদের ভাষায় অনেক জিপসী শব্দ। তবু ওরা সাচ্চা জিপসী নয় বলেই অনেকের ধারণা।

ইউরোপে যারা ভালুক নাচায়, তাদের বলা হয় 'উরসারি' (Ursari)। তাদের মধ্যেও বৃত্তি বিভাগ রয়েছে। রয়েছে পেশা অনুযায়ী নাম। সে তালিকা প্রায় বল্লাল সেনের কুল পঞ্জিকার মতো, দীর্ঘ এবং জটিল। একজন গবেষক চৌদ্দটি বিভিন্ন গোষ্ঠী তালিকাভুক্ত করেছেন। তারপর তাঁর মন্তব্য : তালিকা বোধহয় অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

এই লোভারি কি ভারতেরই লোহার? সিন্তি কি সিন্ধী? গাউরাখি কি ভূতপূর্ব সৌরাষ্ট্রবাসী? ইউরোপের জিপসী তা বলতে পারবে না। 'ফুরিদাই বা বৃদ্ধা ঠাকুমা আগুনের ধারে বসে নাতি নাতনিদের জিপসীর জন্মকথা বলার সময় সিন্ধু বা সৌরাষ্ট্রের নাম করে না। চোখ বুজে সে বলে যায় :

সে অনেক কাল আগের কথা। 'ও দেবল' চুল্লি জ্বেলে মানুষ গড়তে বসেছেন। 'ও দেবল' মানে ঈশ্বর। ঈশ্বর চুল্লিতে আগুন দিয়ে বসেই আছেন ওদিকে যে কী কাণ্ড হচ্ছে তাঁর মোটে খেয়াল নেই। খেয়াল যখন হল, তখন ছুটে গিয়ে মূর্তিগুলো বের করে দেখেন সেগুলো পুড়ে কালো হয়ে গেছে। ওরাই পৃথিবীর প্রথম মানুষ। ওরা অন্য মুলুকে থাকে। গাজোরা ওদের বলে নিগ্রো। যা হোক, ঈশ্বর আবার দুটি মূর্তি উনুনে দিলেন। এবার তিনি খুব হুঁশিয়ার। দিয়েই, পরক্ষণেই সে দুটোকে টেনে বের করে নিলেন। ফলে এবার মূর্তি ভালো করে পুড়তে পারল না, ফ্যাকাসে রয়ে গেল। ওরাই 'পার্শো'—সাদা মানুষ। তৃতীয় বার আর তিনি ভুল করতে রাজি হলেন না। খুব হুঁশিয়ার হয়ে উনুনের ধারে বসে রইলেন। তারপর ঠিক সময়ে বের করে নিলেন পুতুল দুটি। এবার তৈরি হল—রোম খাঁটি মানুষ। তারা খুব কালোও নয়, আবার খুব ফর্সাও নয়। আমরাই সেই রোম!

সিন্ধুর প্রসঙ্গ তুলে তাদের কাছে কথা পাড়লে কোনও কোনও জিপসী গোষ্ঠী শুরু করে অন্য গল্প

সে অনেক, অনেক কাল আগের কথা। আমরা তখন বাস করি গঙ্গার ধারে। আমাদের দলপতির মতো মানুষ তখন দেশে দ্বিতীয়টি নেই। তাঁর খুব নামডাক। একটি মাত্র ছেলে তাঁর। নাম—টিকেন। হিন্দে তখন একজন মস্ত রাজা ছিলেন। তাঁর একটি মাত্র মেয়ে। নাম তার গান। অপূর্বসুন্দরী কন্যা। আমাদের সর্দার মারা যাওয়ার পর টিকেন বলল—আমি ওই মেয়েটিকে বিয়ে করব।

কিন্তু দেশের লোক বলাবলি করতে লাগল, টিকেন আর গান আসলে ভাই আর বোন। ওদের বিয়ে হলে অনাচার হবে। আসলে ওরা মোটেই ভাই আর বোন ছিল না। লোকে তবু কুৎসা রটাতে লাগল। ফলে দেশ দু'ভাগ হয়ে গেল। একদল বলল—টিকেন ঠিক, অন্যদল বলল—না, টিকেনের মতিভ্রম হয়েছে। গণতকাররা শুনে বলল— দেশ পাপে টলছে, এবার শত্রু আসবে। তাই এল। ঝড়ের মতো সিকেন্দরের এক সেনাপতি এসে হাজির হল আমাদের রাজ্যে। আমরা তার কাছে গিয়ে বললাম—বিদেশি, তুমিই বিচার করো। বিদেশি তার কথা না শুনে রেগে গিয়ে আমাদের একটা মানুষের মাথায় আঘাত করে বসল। সঙ্গে সঙ্গে মস্ত সেনাপতি ঢাল তলোয়ার সমেত পথের ধুলোয় মিশে গেল।

যা হোক, আমাদের ঝগড়া কিন্তু থামল না। শেষ পর্যন্ত টিকেনের শত্রুরাই জয়ী হল। বেচারা টিকেনকে তারা দেশছাড়া করে ছাড়ল। দেবতা তাকে অভিশাপ দিল— তোমার সন্তানেরা এখন থেকে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে। তারা কোথাও

এক রাত্তিরের বেশি ঘুমোতে পারবে না এক কুয়োর জল দুবার পান করতে পারবে না। তাই আমরা আজও ঘুরে বেড়াই।

এই সিকেন্দর কি আলেকজাণ্ডার? কোনও কোনও সন্ধানী তা-ই মনে করেন। তাঁরা বলেন, ১০০০ অব্দ জিপসীর জন্ম তারিখ নয়। ভারত থেকে গৃহহারাদের স্রোত শুরু হয়েছিল আলেকজাণ্ডারের সময়ে। বিজয়ী আলেকজাণ্ডার যাদের শিকলে বেঁধে স্বদেশ যাত্রা করেছিলেন জিপসী সেই হতভাগ্য বন্দি দলের বংশধর।

কেউ কেউ আবার মনে করেন, এদের ঘরছাড়া করেছিলেন গজনির সুলতান মামুদ। একের পর এক সতেরো বার ভারতে হানা দিয়েছিলেন তিনি। প্রতিবারই লুঠের ধন হিসেবে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন হাজার হাজার দাস। এরা তাদেরই উত্তরপুরুষ। অবশ্য এমনও হতে পারে, ওরা সবাই বন্দি ছিল না, কোনও কোনও গোষ্ঠী নিশ্চয় ভাগ্যের সন্ধানে বিদেশি বাহিনীর পিছু পিছু যাত্রা করেছিল পশ্চিম দিকে। মিস্ত্রিরা বাহিনীর জন্য ঢাল তলোয়ার গড়ত, অন্যরা ঘোড়ার সেবাযত্ন করত। সৈন্যদের কাছে গায়ক এবং নর্তকীদেরও নিশ্চয় খাতির ছিল খুব। কে জানে, আজ ইউরোপের শহরতলিতে যে জিপসী ছুরি কাঁচিতে ধার দেয় এক সময় তার পূর্বপুরুষেই হয়তো এমনি একটা সহজ যন্ত্রেই মুসলিম অভিযানকারীদের তলোয়ার সান দিত! মধ্যযুগে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে নানা দেশে দেখা গেছে ভারতের দেশত্যাগীদের।

একদিকে তার সামনে যেমন সেদিন বাইরের দুনিয়ার হাতছানি, অন্যদিকে পেছনে তেমনি স্বদেশি সমাজের তাড়না। জিপসীর ঘর ছাড়ার কাহিনিতে চাপ আর আকর্ষণ, যুগপৎ দুই-ই সেদিন সক্রিয়। আধুনিক গবেষকরা বলেন—ভবঘুরেরা অধিকাংশই ভারতের পতিত সম্প্রদায়গুলো থেকে আগত। ওরা স্বদেশেও ছিল কর্মকার, জুয়াড়ি, গণতকার হাতিঘোড়ার খিদমদগার কিংবা পেশাদার নর্তকী গায়ক। মনুর বিধানে ওরা প্রায় সবাই অস্পৃশ্য। এদের যতখানি সম্ভব দূরে দূরে রাখাই সংগত। বাইরে থেকে এসেছে শত্রু তারা আমোদ চায় সত্যিকারের কাজের মানুষ চায়। অন্যদিকে ঘরে এই উদাসীন সমাজ। মান নেই, ইজ্জত নেই; জমি নেই ঘর নেই। সুতরাং বন্ধনও নেই।

ইতিহাসের এক অশান্ত অধ্যায়ে অতএব ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ঘর ছাড়ার ব্যাপক প্রবণতা। যারা বন্দি হল না তারাও চলল বন্দি ভাইদের পিছু পিছু। ওরা সেদিন পশ্চিমযাত্রী, কারণ কাছাকাছি সীমান্ত সেদিকেই। দ্বিতীয়ত, হানাদারদের আগমনে স্পষ্ট হয়ে গেছে সীমান্তের ওপারেও মুলুক আছে। সম্ভাবনাময় অন্য

দুনিয়া। তৃতীয়ত, পুব থেকে পশ্চিম—অনন্ত কাল ধরে সূর্যেরও তাই পথ।

হাজার হাজার নরনারী ও শিশু ক্ল্যাসিক্যাল পৃথিবীর এই প্রিয় ধারণা মনে রেখেই অস্তগামী সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পা বাড়িয়েছিল পশ্চিম দিকে। কোনও দল পায়ে হেঁটে কোনও দল ঘোড়ার পিঠে। গাধা কিংবা ঘোড়া আজও জিপসীর কাছে তাই সবচেয়ে আদরের প্রাণী। সব রকম প্রাণীর মাংস খেতে রাজি, কিন্তু কখনও ঘোড়ার মাংস নয়। কেউ মারা গেলে জিপসী তার আদরের ঘোড়াটিকেও সঙ্গে কবর দেয়। এই মোটর গাড়ির যুগেও অনেক জিপসী মনে করে—যার ঘোড়া নেই সে জিপসী নয়। ইউরোপে এখনও অনেক জিপসী ঘোড়ায় টানা গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সুযোগ পেলে ঘোড়ার খুরে চটের মোজা পরিয়ে রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দ পাড়ি জমায় অন্য দেশে।

জিপসীর নেশা এখনও বেড়ানো।

ঘুরে বেড়ানো আরও অনেকেরই নেশা। কিংবা পেশা। বছরভর গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড এবং তার শাখা উপশাখা ধরে নানা ভবঘুরে দলের আনাগোনা। কেউ চলে পায়ে হেঁটে কেউ গাধা কিংবা ঘোড়ার পিঠে। কারও বা বাহন গোরুর গাড়ি। কারও পেশা সওদাগরি, নানা ধরনের জিনিস ফিরি, কারও ভালুক অথবা বাঁদর নাচানো, কিংবা নিজেদেরই রকমারি খেলা দেখানো। কেউ বা আবার পেশাদার শিকারি—শিয়াল মার, বান্দর মার, কিংবা পাখ মার। এরা এদেশের যাযাবর। কিন্তু এরা জিপসী নয়।

বছর কয়েক আগে এদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য সরকারের উদ্যোগে একটি সমীক্ষক দল গঠিত হয়েছিল। অনুসন্ধান অন্তে তাঁরা জানান, ভারতে যাযাবরের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ! যাযাবরদের তারা ভাগ করেছেন পাঁচ ভাগে : (১) খাদ্য সংগ্রাহক, (২) মেষ কিংবা অন্য কোনও পশুচারক (৩) ব্যবসায়িক যাযাবর (৪) অপরাধপ্রবণ ভবঘুরে এবং (৫) ভ্রাম্যমাণ ভিক্ষুক দল।

ভারতে এখনও কিছু কিছু মানুষ আছে, যারা লোহা কিংবা পাথরের অস্ত্রের ব্যবহার জানে না। যথা: অন্ধ্রের চাল্লা ইয়ানাদিস (Challa yanadis) এবং চেঞ্চু (Chenchus), কিংবা গোদাবরী উপত্যকার কয়ারা (Koya)। জীবন তাদের একখানা মাটি খোঁড়ার কাঠি নির্ভর। তাই দিয়ে তারা শেকড় তুলে কিংবা ইঁদুর মেরে ঘুরে বেড়ায়। মাদ্রাজ এলাকায়ও নাকি তাদের দেখা যায়। সেখানকার চেঞ্চুরা শিকারে এতই অপটু যে, মাছের লোভে অনেক সময় তারা ছোটখাট জলায় কিংবা পুকুরের জলে বিষ মেশায়। ইয়ানাদিসরা বিশেষ কৌশলে মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করে তা-ই খায়। এ জাতীয় যাযাবর খাদ্য সন্ধানী দল আরও আছে। বিহারে 'বিহোর'রা (Bihor) নাকি বাঁদর শিকার করে, বাংলার কাকমাররা (Kakmar) শিকার করে কাক। তবে ভবঘুরে ওরা নামেই। আসলে এইসব গোষ্ঠী সাধারণত বিশেষ রাজ্যের এলাকাতেই ঘোরাফেরা করে।

ভ্রাম্যমাণ পশু প্রতিপালকের দল দেখা যায় ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের রাজ্যগুলোতে। কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থানের

কোনও কোনও এলাকায়। গুজ্জর (Gujjar), বকরওয়াল (Bakarwal) গাদ্দি (Gaddi), রেবারি (Rebari)—এদের পেশা গোরু ভেড়া ছাগল চড়িয়ে বেড়ানো। দক্ষিণ ভারতে একই ধরনের পেশা লাম্বাদা (Lambada) লাম্বানি (Lambani) প্রভৃতি গোষ্ঠীর। বিখ্যাত ভবঘুরে দল বাঞ্জারাদেরও (Banjara) অন্যতম পেশা গো-পালন। তাদের কথায় পরে আসছি।

ঘুরতে ঘুরতে যারা ব্যবসা করে ফেরে, তাদের মধ্যে সুখ্যাত গাড়িয়া লোহার (Gadia Lohar) শিকলিগর (Sikligarh), ইরানি (Irani) প্রভৃতি কয়টি যাযাবর গোষ্ঠী। এদের প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে তথাকথিত 'অপরাধী'দের সম্পর্কে দুচারটি কথা। কোনও কোনও যাযাবর গোষ্ঠীর মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দেখা যায়। তার মানে নিশ্চয় এই নয় যে, তারা চিরকাল দুর্বৃত্ত ছিল, কিংবা চিরকাল তাই থাকবে। ইংরেজ আমলে এদের নাম দেওয়া হয়েছিল 'ক্রিমিন্যাল ট্রাইব্স'—অপরাধী উপজাতি। ১৮৭১ সনে আইন করে তাদের স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ওরা স্বভাব দুর্বৃত্ত বলেই ভবঘুরে, না ভবঘুরে বলেই অপরাধ করতে বাধ্য হয়, বিদেশি শাসকদের তা বিচার বিবেচনা করে দেখার সময় ছিল না। স্বাধীনতার বছরে (১৯৪৭) প্রথমে মাদ্রাজ সরকার এবং পরে ভারত সরকার (১৯৫১) ওদের ললাট থেকে সে কলঙ্কতিলক মুছিয়ে দেন। নতুন আইনে ওরা 'অপরাধপ্রবণ'-মাত্র ঘৃণ্য বা ভয়াবহ কোনও নরগোষ্ঠী নয়। এদের তালিকায় পাওয়া যাবে রাজপুতানার কঞ্জর ভাট (Kanjar Bhat), উত্তর ভারতের বাউরি (Bauri) এবং ডোম (Dom), অন্ধ্রের কোরাভা (Korava) ইত্যাদি নানা গোষ্ঠীকে। ভবঘুরে ভিখারি সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে দক্ষিণ ভারতের রামস্বামী (Ramaswami) এবং রঙ্গস্বামী (Rangaswami) সম্প্রদায় এবং বুদাবুক্কালরা (Budabukkal) উত্তর ভারতের কারাওয়াল (Karawal) প্রভৃতি গোষ্ঠী।

এদের প্রায় প্রত্যেকেরই নিজেদের আদি সম্পর্কে অনেক বলার কথা আছে। কঞ্জর ভাটরা বলে, আমরা বনেদি রাজপুত। এক সময় আমরা রাজসভায় কবি ছিলাম। টড সাহেব মনে করেন, ওরা আসলে উচ্চবর্ণের রাজপুতদের ভৃত্য ছিল। পতনের কারণ হিসাবে ওরা মুসলিম আক্রমণের কথা বলে। কখনও বা বলে অন্য গল্প। ওরা নাকি ভাজোরি নামে এক বিখ্যাত নর্তকীর সন্তান সন্ততি। একদিন সে গুজ্জর রাজার দরবারে দড়ির উপর নাচছিল। রাজা বললেন—এই সোনার হার ছুড়ে দিচ্ছি, নাচতে নাচতে যদি ধরতে পার, তবে এটি তোমার। ভাজোরি তালভঙ্গ না করেই সেটি লুফে নিল।

রাজাকে নেশায় পেয়ে গেল। তিনি একের পর এক পুরস্কার ছুঁড়ে দিতে

লাগলেন। শেষে রাজ্যই দিয়ে দেওয়ার উপক্রম। দর্শকদের মধ্যে ছিল ঈর্ষাকাতর আর এক নর্তকী। সে তখন আর থাকতে না পেরে পাশে-বসা একটি বাচ্চা ছেলের গালে চড় মেরে বসল। ছেলেটি কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে গিয়ে দড়ি থেকে পড়ে গেল ভাজোরি। তারপর সে মারা গেল। মরার আগে আপনজনদের বলে গেল, আর কখনও তোমরা দড়ির উপর নাচবে না, মাথায় কিছু বসিয়ে তার উপর জলের কলসি বইবে না, নদীর জল খাবে না। ইত্যাদি। উত্তর ভারতে বাওয়ারিয়া (Bawaria) নামে একটি সম্প্রদায় আছে। তারা নাকি মনের দুঃখে ভবঘুরে। এক রাজপুত প্রধান আকবরের মনোজয়ের জন্য তাঁর কন্যাকে উপহার পাঠাচ্ছিলেন দিল্লিতে। সঙ্গে যাচ্ছিল ওরা। মেয়েটির আদৌ ইচ্ছা নয় সে মুঘল হারেমে ঢোকে। পথে দিল্লির কাছে বাউলি—জলাশয়। সেখানে পৌঁছানোর পরে সে বলল, আমি জল খাব। পালকি থেকে নেমে দুঃখী রাজকুমারী ঘাটে গেল জল খেতে আর ফিরল না সে। জলে ঝাঁপ দিল। মনের দুঃখে তার অনুচরেরাও আর ঘরে ফিরল না, তারা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বাউলি থেকেই নাকি বাওয়ারিয়া। রামস্বামী আর রঙ্গস্বামী নামক ভিখারি দল দুইটি নাকি ছিল আচার্য রামানুজের অনুরাগী প্রচারক দল! ডোমরা বলে তারা আদিতে ছিল সদ্বংশজ। রাজা বানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক। নানারকম খেলা দেখিয়ে আর নেচে দল চালায় নাটের দল। জিজ্ঞাসা করলে ওরাও বলবে, আমরা জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণ। পাপের ফলে পতিত। শেষে আমাদের পূর্বপুরুষ এক সন্ন্যাসীকে ধরে পড়ল। বলল—বাবা আমাদের একটা বিহিত কর। তিনিই আমাদের এ বিদ্যা শিখিয়ে দিলেন।

এদের সকলের মধ্যেই ইউরোপের জিপসীদের কিছু না কিছু লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে অনেকে মনে করেন, আত্মীয়তা বিশেষ করে স্পষ্ট কয়েকটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে এবং তাদের অগ্রগণ্য বাঞ্জারারা। উইলিয়ামস্ (H.L.Williams) ভারতের যাযাবর সম্প্রদায়গুলোকে ভাগ করেছেন ছয় ভাগে : (১) ভানটু (Bhantu) , (২) বাদিয়া (Badiya), (৩) বানজারা (Banjara) (৪) বাওরিস (Baorish), (৫) বিলক (Biloc) এবং (৬) ভাঙ্গি (Bangi) বা চুরা (Chura) । ডোম, মিরাসী, সাপুড়িয়া—এরা তাঁর মতে বাদিয়া বলে গণ্য হতে পারে। ডোমদের দুটো ভাগ. এক ভাগে পড়ে বাদিয়া ডোম। ওরা নাচে, গায়। দ্বিতীয় ভাগে আছে—বাদিয়া নাটরা; তারা নানা রকমের খেলা দেখায়। সাপুড়িয়া তাদের একটি উপসম্প্রদায়। শিকলিগরদেরও তিনি নাট সম্প্রদায়ভুক্ত বলে মনে করেন। তাঁর অভিমত—বাঞ্জারাদের নাট বলে গণ্য করা যেতে পারে। কয়েক পুরুষ

আগে তারা মূল গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এই যা। কারও কারও মতে গাড়িয়া লোহাররাও বাঞ্জারা অর্থাৎ একই আদিগোষ্ঠীর আর একটি শাখা।

গাড়িয়া লোহাররা ভ্রাম্যমাণ লোহার মিস্ত্রি। বড় বড় গোরুর গাড়িতে চড়ে তারা ঘুরে বেড়ায় বলেই তারা গাড়িয়া লোহার। শিকলিগররাও লোহার কাজ করে, ছুরি কাঁচি বানায়, ধার দেয়। তবে তাদের গাড়ি নেই। গাড়িয়া লোহাররা শত শত বছর ধরে ভবঘুরে জীবনযাপন করে চলেছে। গোটা গ্রীষ্ম ওরা ঘুরে ঘুরে কাজ করে, বর্ষায়ও গাড়িতেই আশ্রয় নেয়। ওরা বলে, আমরা রানা প্রতাপের অনুচর। রানা যেদিন চিতোর গড় ছাড়েন সেদিন থেকেই তারাও ভবঘুরে। ১৯৫৫ সনের এপ্রিল মাসে জওহরলাল নেহরু তাদের আবার নিয়ে গিয়েছিলেন চিতোর গড়ে—এই দেখ, দুর্গ এখন তোমাদেরই দখলে, এবার ঘরে ফের। কিন্তু এখনও বোধহয় ওরা স্থায়ী হয়ে কোথাও আস্তানা পাতেনি।

বাঞ্জারাদের আরও অনেক নাম; লাম্বানা (Lambabna), লাম্বাডি (Lambadi) লাবানা (Labana), মাথুরিয়া (Mathuria) ইত্যাদি। বাঞ্জারা শব্দটার মানে নাকি বনচর। ওরা উত্তর পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতে ভ্রাম্যমাণ পশুপালক। একসময় নাকি ওরা গরু ঘোড়ার খাদ্য সরবরাহ করত। ওদের গোরু, বলদ বিখ্যাত। মুঘল আমলে হায়দারাবাদ আর দিল্লির মধ্যে ভারবাহী পশু নিয়ে যাতায়াত করত ওরা। পথের ধারে তাঁবু ফেলে খদ্দেরদের আশার অপেক্ষা করত। মুঘল বাহিনীতেও নাকি বলদ সরবরাহ করত ওরা। ওরা নাচ গান খুব ভালোবাসে। ওদের মেয়েরা দেখতে খুব সুন্দরী। তারা বর্ণাঢ্য পোশাক পরে। ঘাঘরা এবং চোলিতে কাচের টুকরো দিয়ে বাহারি নকশা ফুটিয়ে তোলে। ওদের সর্বাঙ্গে গহনা।

জিপসী সম্পর্কে আগ্রহী একজন পশ্চিমি দর্শক ডেরেক টিপলার (Derek Tipler) হায়দরাবাদ দেখা একদল বাঞ্জারার বিবরণ দিচ্ছেন

বলদে টানা গাড়িতে ওরা চলেছে। গাড়িগুলো চমৎকার। নানারকম ছবি নকশা আর কাঠখোদাইয়ে সুসজ্জিত। দলপতি নিজেকে বলল—নায়েক। ওদের ভাষা—চলতি হিন্দুস্থানি। মেয়েরা খঞ্জনি নিয়ে নাচে। ওদের সাজ পোশাক দেখবার মতো। নীল আর সবুজ মিলিয়ে ঘাঘরার রং। আঁটোসাঁটো চোলি।

তিনি লিখেছেন—আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই যে, এই বাঞ্জারারাই আমাদের জিপসীর নিকট-আত্মীয়। তিনি অবশ্য ইরানিদেরও বাঞ্জারাদের একটি শাখা বলেই মনে করেন। তাঁর মতে—ওরা পারস্য থেকে আসেনি। ইঙ্গিতে ওরা উত্তর দিক দেখায় মাত্র। বাঞ্জারা আসলে উত্তর পশ্চিম ভারতেরই লোক।

উইলিয়াম্‌স মনে করেন, ভানতুরা ছিল জাঠদের চারণ এবং পশুচারক। বাঞ্জারারা একই কাজ করত—রাজপুত এবং গুজরদের জন্য। ওদের দুই দলের আস্তানা, সাজ-পোশাক এবং সঙ্গী গোরু ঘোড়া কুকুর মুরগি দেখে তাঁরও কিন্তু মনে পড়েছিল জিপসীদের কথা।

এই প্রসঙ্গে ইরানি এবং বাংলাদেশের বেদেদের সম্পর্কে কটি কথা। টিপলার যেমন মনে করেন, ইরানিরা আসলে বাঞ্জারা, উইলিয়ামস্ তেমনই বেদে নামক বন্ধনীতে অনেককেই ফেলেছেন।

ইরানেও জিপসী আছে। বস্তুত, কমপক্ষে খ্রিস্টীয় ১১০০ অব্দ থেকে সেখানে নাকি জিপসীদের কথা শোনা যায়। সাম্প্রতিক একটি হিসাবে দেখেছিলাম এখনও সেখানে ভবঘুরে রয়েছে প্রায় বারো হাজার। তাদের নানা নাম : ফিউজি (Fyudije), হামদান (Hamdam) সৌরাষ্ট্রী (Saurastri) লুরি (luri), চাঙ্গি (Changi)—ইত্যাদি ইত্যাদি। ইরানের এক গবেষক নাকি বলেন—তাদের দেশের ভবঘুরেরা পুবে গেছে ভারতে, পশ্চিমে গেছে ফ্রান্স অবধি। উইলিয়ামস্ মনে করেন, ওরা পারস্য, ইরাক এবং মধ্য এশিয়ার ভবঘুরে। ফইজু ইরানি নামে একজন দলপতি তাঁকে বলেছে—আমরা একদিকে কনস্টানটিনোপল অবধি যাই, এদিকে কলকাতা। ওরা ঘোড়া, ছুরি কাঁচি, পুরনো মুদ্রা, মুর্শিদাবাদি সিক্কা, তাবিজ মাদুলি ইত্যাদি বিক্রি করে। ভ্রাম্যমাণ দলের সঙ্গে কুকুর, মুরগিও থাকে। মেয়েরা হাতও দেখে। হাত সাফাইয়েও তারা রীতিমতো ওস্তাদ। ১৮৮৪ সনে চার হাজার ইরানিকে ভবঘুরে আইন অনুসারে ধরে নিজামের মুলুক থেকে তাড়িয়ে নিয়ে আফগান সীমান্ত পার করে দিয়ে এসেছিলেন সরকার বাহাদুর। কেউ কেউ মনে করেন, ওরা একই সঙ্গে ইরাক, ইরান আর উত্তর পশ্চিম ভারতের চিহ্নবাহী। ওয়ারবার্টন (Warburton) নামে আরর এক গবেষক বলেন—ওরা আসলে মধ্য এশিয়ার সানসি (Sansi), ভারতে এসেছে পারস্য থেকে। কিন্তু যদি ওদের জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে হয়তো উত্তর দেবে—ময়ে মুঘল মিহস্তিম—আমরা মুঘল। যদি বলা যায়, তোমরা কি সিরিয়া থেকে এসেছ? তবে উত্তর মিলবে হয়তো—ময়ে বাসিন্দা গান-ই ইরান মি বাসিন। আমরা ইরানের লোক। কিংবা বলবে—মুলকই মা হামিন জাস্ত! এটাই আমাদের দেশ।

ইরানিরা অতি ক্ষিপ্রগতি। পালাতে গিয়ে এক রাত্তিরে তারা চল্লিশ মাইল পাড়ি দিয়েছে, এমন রেকর্ড রয়েছে। দরকার হলে অবশ্য ওরা ট্রেনেও চড়ে। তাদের লক্ষ্য প্রধানত শহর। শহরতলিতে ছাউনি ফেলে তারা শহরে হানা দেয়। ওরা বহুভাষী। এমনকি ইংরাজি শব্দও ব্যবহার করে। দলে মেয়েদেরই প্রাধান্য।

ইরানি মেয়ে দেখতে সুন্দরী। চিফছিপে দীর্ঘ গড়ন তাদের। চোখের রং বাদামি। লম্বা কালো চুল। ওরা উজ্জ্বল পোশাক পরে; হাতে পায়ে নাকে কানে গহনা। অনেকের চিবুকে এবং কপালে নীল উলকি বিন্দু। বিবাহিত মেয়েদের মাথায় বাঁধা রেশমি রুমাল। সাধারণত দশ পনেরোটি পরিবার একসঙ্গে চলে। বিয়ে শাদি নিজেদের গোষ্ঠীর বাইরে হয় না বললেই চলে। একবার বিয়ে হয়ে গেলে মা আর মেয়ের হয়তো জীবনে আর দেখাই হল না।

বাংলাদেশের বেদেরা কথা বলে বাংলা ভাষায়। বহুকাল আগে (১৮৭০) লন্ডনের অ্যানথ্রপলজিক্যাল সোসাইটির জার্নালে তাদের সম্পর্কে একটি রচনায় তাদের যেসব পেশার কথা বলা হয়েছিল, মহুয়া গীতিকাব্যের হোমরা বেদের দলের পেশার সঙ্গে হুবহু তার মিল। ওরা খেলা দেখায়, ভালুক বাঁদর সাপ নাচায়, ঔষধ বিলি করে, ঝুড়ি গড়ে, ছাগল ভেড়া পাখি বিক্রি করে। ওদের সঙ্গেও থাকে কুকুরের দল। বেদেনি আবার ইরানির মতো হাতও দেখে। ইরানির সঙ্গে তাদের আরও এক বিষয়ে বিলক্ষণ মিল। বেদে মেয়েরাও উলকি পরে, দুই ভুরুর মাঝখানে, নীচের ঠোঁটের নীচে। কখনও কখনও বুকে এবং হাতের পিঠেও। ওরা স্পষ্টতই বাঙালি নয়। লেখক জানিয়েছেন, ওদের দেবী হল চৌধি (Chowdhi)। হয়তো অন্য নামে চণ্ডী। তাঁর প্রধান মন্দির নাকি মালাবারে। সেখানেও রয়েছে অনেক বেদে। কৃষ্ণানদীর উত্তরে যারা বাস করে, তারা বলে—আমাদের তীর্থ কান্দাহারে।

জীবনাচারে এইসব ভারতীয় যাযাবর এবং ইউরোপ ও আমেরিকার জিপসীর কিছু সাযুজ্য থাকলেও দুই সম্প্রদায় যে এক নয়, তা স্পষ্ট। তবু ইউরোপীয় জিপসীর কথা বলতে গিয়ে আমাদের আপন অঙ্গনে ভ্রাম্যমাণ ইরানি, বেদে ওদের কথা টেনে আনতে হল, কারণ, সাধারণের কাছে ওরাও জিপসী। অথচ এদের অধিকাংশই কিন্তু আমাদের দেশেরই সন্তান। নানা কারণে ছিন্নমূল—ঘরহারা। ছোট ছোট দল বেঁধে তারা বৃহত্তর সমাজের আঙিনা দিয়ে যাওয়া আসা করে, কিন্তু তার বাঁধনে ধরা দিতে চায় না। সমাজের প্রতি তাদের এই অবিশ্বাস এবং বিরূপতার পেছনে রয়েছে হয়তো পুরনো দিনের কোনও অত্যাচারের কাহিনি, উচ্ছেদ, আধিপত্য কিংবা প্রভুত্বের করুণ ইতিবৃত্ত। আজ ওরা ঘটনাগুলো ভুলে গেছে। কিন্তু অবশিষ্ট সমাজের প্রতি বিশ্বাস এখনও ফিরে পায়নি। তাই এই বিশাল দেশে যুগান্তকারী নানা কাণ্ডকারখানার মধ্যেও ওরা নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ।

এদের আমরা জিপসী বলে যে ভুল করি, সে ভুল অন্যরাও করেন বটে,

তবে—সজ্ঞানে। গ্রিয়ারসন (G.A. Grierson) ভারতের ভাষাসমূহের সুখ্যাত সমীক্ষক। তাঁর বিপুলায়তন সমীক্ষার একাদশ খণ্ডটির নাম দিয়েছিলেন জিপসী ল্যাঙ্গুয়েজেস (Gipsy Languages)। সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের ভূমিকায় স্পষ্ট করে তিনি বলে দিয়েছেন—শব্দটার চল আছে বলেই ব্যবহার করা হল। তার অর্থ এই নয় যে, ইউরোপের জিপসীদের সঙ্গে এদের কোনও যোগাযোগ রয়েছে।

ভারতীয় ভবঘুরেদের মুখে তিনি তিরিশটি উপভাষার (dialect) সন্ধান পেয়েছেন। আগেই বলা হয়েছে, ওরা যে অঞ্চলের পরিধিতে ঘুরে বেড়ায় কিংবা বেশি দিন কাটায়, সাধারণত সেখানকার স্থানীয় ভাষাই ব্যবহার করে। গ্রিয়ারসন বলেন, ওদের সাংকেতিক ভাষাও (Argot) আছে। সেগুলোকে বলা হয়, 'পার্শি' বা 'পার্শিয়ান'। ১৯১১ সনের লোক গণনায় দেখা গেছে, ২৮,২৯৪ জন যাযাবর ওই তিরিশ ভাষা তথা জবান বা বাচন এবং সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে। ভাষাগুলোর মধ্যে আছে—বেলদারি (Beldari) ভামতি (Bhamti), লাদি (Ladi), ওদকি (Odki) ইত্যাদি এবং গোপন সান্ধ্যভাষার মধ্যে রয়েছে—ডোম (Dom), গারদি (Garodi), গুলগুলিয়া (Gulgulia) নটি (Nati) সাসি (Sasi) ইত্যাদি। তিনি বলেছেন, ইউরোপীয় জিপসীদের ভাষার সঙ্গে ডোম-এর মুখের ভাষার কিছু কিছু মিল রয়েছে। খুঁজলে অন্য ভাষাও দুচারটি রোমানি শব্দের কাছাকাছি শব্দ খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন—রোমানিতে যা 'গাজ্জো' (gajjo) বা ভদ্রলোক, সাসিতে তা কাজ্জা (kajja) নটিতে—কাজা (kaja)। রোমানিতে কুকুরকে বলা হয়—জুকেল (Jukel), কনজারিতে—জুকিল (jukil), সাসিকতে—ছুকাল (chhukal) কিংবা ভুকাল (bhukal) ইত্যাদি। তবু তিনি মনে করেন—ইউরোপীয় জিপসীর ভাষা বিশেষ কোনও যাযাবর সম্প্রদায়কে নয়, তার উৎপত্তিস্থান হিসাবে নির্দেশ করে উত্তর পশ্চিম ভারতকে।

আধুনিক গবেষকরা ইদানীং ওই এলাকাতেই তাঁদের সন্ধানী দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন। একজন মনে করেন রোমাণি ভাষার আদি খুঁজতে হবে ইন্দো আর্য ভাষার কেন্দ্রীয় গোষ্ঠীতে। অর্থাৎ রাজস্থানি, হিন্দি ইত্যাদিতে। ডব্লিউ আর ঋষি মনে করেন—ইউরোপের জিপসী আদিতে রাজপুত। রাজপুত কোনও একটা জাতিকে বোঝায় না। রাজপুত বলতে ক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের বোঝায় মাত্র। ওরা আর্য। জাঠরা রাজপুতদের ছত্রিশ গোষ্ঠীর এক গোষ্ঠী।

ঋষি জাঠ এবং রাজপুতদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আদিতে ওরা সাইথিয়ান বা শক। হেরোডোটাস ওদের কথা উল্লেখ করেছেন। জাঠরা

একসময় বাস করত মধ্য-এশিয়ায় সিরদরিয়ার মুখে এবং আরব সাগরের পশ্চিম তীরে। সেটা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের কথা। শকদের একটি দল ভারত আক্রমণ করে খ্রিস্টপূর্ব ১১০ অব্দ নাগাদ এসে পৌঁছায় সিন্ধু তীরে। খ্রিস্টপূর্ব ৮৭ অব্দে তারা কাবুল দখল করে, তার সাত বছর পরে তক্ষশীলা এবং কান্দাহার। সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছেদ ঘটল ওই এলাকা থেকে শতবর্ষের ইন্দো-গ্রিক শাসনের। ধীরে ধীরে সিন্ধু উপত্যকা থেকে তারা ছড়িয়ে পড়ল পশ্চিম ভারতের গুজরাত অবধি। এই অঞ্চলের নাম হয়ে গেল—ইন্দো-সাইথিয়া। পরবর্তীকালে আগন্তুক অভিযাত্রীরা উত্তর হরিয়ানা এবং গাঙ্গেয় উপত্যকায়ও ছড়িয়ে পড়ে। ঋষি বলেন— পট সাহেব বহুকাল আগেই বলেছিলেন, ইউরোপের জিপসী জাঠদের বংশধর। তাঁর এই তত্ত্বের সমর্থন করেছেন আরও কোনও কোনও গবেষক। তাঁরা মনে করেন—ভারতের জাঠদের ভাষার সঙ্গে রোমানি ভাষার যেমন সাদৃশ্য তেমন আর কোনও ভাষার সঙ্গে নয়। ঋষি দুহাজার রোমানি শব্দ পর্যালোচনা করে দেখিয়েছিলেন, এ ভাষা হিন্দি, রাজস্থানি এবং পাঞ্জাবির বেশ কাছাকাছি।

আরবি ঐতিহাসিকরাও পরোক্ষ এই মতবাদের সপক্ষে। বালুচিস্তান এবং সিন্ধু অঞ্চলে এক সময় যে অনেক যাযাবর পশুচারক ছিল, ইতিহাসে সে খবরও পাওয়া যায়। তারপর খলিফা আলির আমলে আরবদের ভারত আক্রমণ। জাঠরা তখন বীরত্বের সঙ্গে তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। তারা আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। খলিফা প্রথম ওয়ালিদ এর আমলে (৭০৫-৭১৫) দ্বিতীয় বারের মতো হানা দেয় আরবরা। এবার উপযুক্ত প্রস্তুতি সহ। জাঠরা উপায়ান্তরহীন হয়ে হানাদারদের সঙ্গে সন্ধি করে। অনেকে তাদের সৈন্যদলে যোগ দেয়। ৭১০ সনে আরব সেনাপতি তাদের অনেককে নিয়ে কুর্দিস্তানে যাত্রা করেন। ছয় বছর পরে দ্বিতীয় ইয়াজিদের সময়েও অনেক জাঠ প্রেরিত হয়েছে আরবি মুলুকে।

দিন যায়। শতবর্ষ পরে ভারতের ওই সন্তানেরা এত ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে যে, তারা আরবি প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। দীর্ঘ চোদ্দো বছর লড়াই করেছে তারা আরব প্রভুদের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত খলিফা মোতাসিম তাদের দমন করেন। সাতাশ হাজার জাঠ নরনারী এবং শিশু বন্দি হয়। তাদের নিয়ে আসা হয় প্রথমে বোগদাদে। তারপর ওদের অনেককে নিয়োগ করা হয় বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। অন্যরা ছড়িয়ে পড়ে ইরান এবং অন্যত্র। এরা—'এশীয় জিপসী'।

ডঃ কোচানোউস্কিও মনে করেন—ওরা রাজপুত; রাজস্থান এবং দিল্লি এলাকার অধিবাসী। দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয় তারা ১১৯২ সনে, তরাইয়ের যুদ্ধের পর। পরাজিত, ছিন্নভিন্ন রাজপুত বাহিনীর একটি অংশ আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে যাত্রা করে ইউরোপের দিকে। আধুনিককালে রক্ত বিশ্লেষণ করেও দেখা গেছে, ইউরোপের জিপসী পাঞ্জাব এবং রাজস্থানের হিন্দু শিখ, ক্ষত্রিয় এবং জাঠদের সঙ্গে রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ।

এইসব আলোচনা থেকে যে তথ্যগুলো পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিদেশি আক্রমণের কথা। গ্রিক, শক, মুসলিম—অনেক হানাদার এসেছে উত্তর পশ্চিমের পথে। তবে ভবঘুরে জিপসী সৃষ্টির কৃতিত্ব মনে হয় শেষোক্ত দলেরই। আমাদের ঘরের ভবঘুরেরা অনেকে যেমন তাদের জন্য ঘরছাড়া, তেমনই ইউরোপের ওই যাযাবর ঝাঁক। ভারতীয় যাযাবরদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করে একজন গবেষক জানিয়েছেন—উত্তর ভারতের হিন্দু যাযাবররা অনেকেই বলতে চায়, তাদের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাজপুতানার ভাগ্য বিপর্যয়ের ইতিহাস। বিশেষ করে ওরা চিতোরগড়ের দিকে আঙুল তোলে। রানি পদ্মিনীর কথা বলে। বলে রানা প্রতাপের কথা। ওরা নাকি নিজেদের ধর্ম বাঁচাবার জন্যই সেদিন বরণ করে নিয়েছিল ভবঘুরে জীবন।

ইউরোপের জিপসী-সে জীবন গ্রহণ করেছিল কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য। আগেই বলেছি, এ গৃহত্যাগের পেছনে স্বদেশের ঔদাসীন্যও কিছু প্রেরণা জুগিয়ে থাকতে পারে। তবে প্রধান হেতু যে সর্বনাশা যুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

এখনও ইউরোপের জিপসী মনেপ্রাণে যুদ্ধকে ঘৃণা করে, কিংবা ভুলে থাকতে চায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার এক কাহিনি শুনিয়েছেন মিত্রপক্ষের এক অফিসার। দক্ষিণ ইতালিতে নেমে সঙ্গীদের নিয়ে সতর্কভাবে এগিয়ে চলেছেন তিনি। হঠাৎ দেখেন, গমের খেতের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে এক জিপসী দম্পতি। ওদের হাতে কোনও অস্ত্র নেই। অকুতোভয় জিপসী সামনে এসে দাঁড়াল। বলল— ঘোড়া চাই তোমাদের? খিল খিল করে হেসে তার বউ জানতে চাইল—হাত দেখাবে?

পথে যেতে যেতে যেখানে যা পাওয়া গেছে জিপসী তাই কুড়িয়ে নিয়েছে। অন্তত ওরা নিজেরা তাই বলে। বিশ্বের প্রায় সর্বত্র জিপসীর অন্যতম পরিচয় — সে কারিগর। হাপর আর টুকিটাকি কয়েকটি হাতিয়ার থলিতে পুরে সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়, নতুন জিনিস গড়ে, পুরনো জিনিসপত্র সারাই করে দিয়ে যায়। লোহা, তামা, টিন, কিংবা সোনা, রুপো—যাই হোক না কেন, জিপসী নিপুণ কারুকর্মী। জিপসী নিজেকে বিশ্বকর্মার অনুচর বলে না বটে, কিন্তু তার এই পেশার গুরুত্ব সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ সজাগ।

ইউরোপের জিপসী সগর্বে বলে গল্পটি। রাজার জন্য তৈরি হয়েছে মস্ত প্রাসাদ। অপূর্ব তার কারুকার্য। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কাজ যেদিন শেষ হল রাজা বললেন—কর্মীদের সবাইকে আমি পুরস্কৃত করতে চাই। তিনি সবাইকে দরবারে ডেকে পাঠালেন। সেজেগুজে সবাই গিয়ে হাজির। রাজা বললেন—তোমরা এই প্রাসাদের জন্য কে কী করেছ আমাকে বল। যাকে আমি শ্রেষ্ঠ কারিগর বলে গ্রহণ করব, তাকে বিশেষ পুরস্কার দেব। সবাই বলে, আমি শ্রেষ্ঠ। দরবারে মহা হট্টগোল। এমন সময় রক্ষী এসে বলল—কালিঝুলি মাখা একটি লোক এখানে আসতে চাইছে। অন্যরা বলল—না মহারাজ, ওকে আসতে দেওয়া ঠিক হবে না। এই উৎসবে কোনও নোংরা লোক না আসাই ভালো। তবু কিছুক্ষণ ভেবে রাজা বললেন—ঠিক আছে, নিয়ে এসো লোকটিকে। পিঠে তার কামারশাল নিয়ে হাজির হল জিপসী। অভিবাদন করে সে বলল—এদের জিজ্ঞাসা করুন তো মহারাজ, আমি যদি ওদের দরকারি সব যন্ত্র গড়ে না দিতাম, তবে কেউ কি কিছু করতে পারত? — কোথায় পেত ওরা পেরেক? রাজমিস্ত্রিই বা কোথায় পেত তার হাতিয়ার? সবাই মাতা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। রাজা বললেন— হ্যাঁ, আমার বিচারে তুমিই সেরা কারিগর। পুরস্কার পেল জিপসী।

কিন্তু জিপসীকে যদি প্রশ্ন করা যায়—কোথায় পেলে তোমরা শক্ত ধাতুকে ইচ্ছেমত আকার দেওয়ার এই আজব বিদ্যা, কোথায় পেলে থলিতে বহনযোগ্য এমন একটি বিস্ময়কর কারখানা—জিপসী তখন অন্য গল্প জুড়বে। গ্রিক পুরাণের গল্প। সে

বলবে, জিউস একদিন তাঁর ছেলে ভলকানের উপর খুব রেগে গেলেন। ভলকান দেবলোকের কারিগর। রেগে গিয়ে তিনি তাঁকে ছুড়ে দিলেন স্বর্গ থেকে। সারাদিন ভলকান বাতাসে ভেসে বেড়ালেন। সূর্য অস্ত গেল। উনি এসে আছড়ে পড়লেন লেমনস দ্বীপে। আমরা তাঁর যন্ত্রপাতিগুলো সেখানে থেকেই কুড়িয়ে নিয়েছি।

গবেষকরা কিন্তু বলেন অন্য কথা। তাঁরা মনে করেন, ইউরোপে ব্রোঞ্জযুগের খবর এনেছে জিপসী। এবং সে খবর বয়ে এনেছে তারা ভারত থেকে। কেননা, এশিয়ায়, বিশেষ করে প্রাচীন ভারতে ধাতুবিদ্যার ব্যাপক চর্চা। তাছাড়া বাল্টিক এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধানের ফলে এমন কিছু কিছু জিনিস পাওয়া গেছে, যাতে এই অনুমান আজ আরও মজবুত ভিতে প্রতিষ্ঠিত। যথা—স্বস্তিক চিহ্নযুক্ত হালকা অস্ত্রশস্ত্র এবং গহনা। স্বস্তিক চিহ্নটির আদি, সবাই মেনে নিয়েছেন—ভারতে। হিটলার এই নকশাটিকে প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করার আগে নরওয়ের জিপসীদের হাতে এবং ঘাড়ের উলকিতেও স্বস্তিক দেখা গেছে। তাছাড়া বাল্টিক এলাকায় স্বস্তিক চিহ্নিত অস্ত্রের সঙ্গে শিঙা বা শিং দিয়ে তৈরি বড় বড় বাঁশিও নাকি পাওয়া গেছে। এসব খুঁটিয়ে দেখেই পণ্ডিতদের ধারণা, জিপসী অতি প্রাচীন অভিযাত্রী। এবং প্রাচীন গ্রিসের ধাতুবিদ্যায় অনেক কিছুই তাদের আমদানি।

কারিগর জিপসীকে স্বদেশে এবং বিদেশে অনেকে যে এড়িয়ে চলতে চাইত তার কারণ ঘাড়ের ওই কামারশাল। তৎকালে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের কাছে কারিগরেরা জাদুকর, তারা শয়তানের অনুচর। কেননা, ওরা শক্ত লোহাকে পুড়িয়ে লাল করে, হাতুড়িকে পিটিয়ে তাকে ইচ্ছে মতো গড়ে। ওরা সৃষ্টি কর্তার শত্রু—তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়। জিপসী উপকথায়ও কিন্তু প্রকারান্তরে কামারশালার বিশেষ মাহাত্ম্যের কথা মেনে নেওয়া হয়েছে। ইউরোপীয় জিপসীর আর একটি প্রিয় গল্প :

একুশ বছর সৈন্যবাহিনীতে ছিল জ্যাক। শেষে তিনটে শক্ত বিস্কুট হাতে গুঁজে দিয়ে ওকে ছাড়িয়ে দেওয়া হল। পথে একজন ক্ষুধার্ত মানুষ ওকে ধরে পড়ল, আমাকে কিছু দিয়ে যাও। জ্যাক তাকে একখানা বিস্কুট দিয়ে দিল। আবার একজন। আবার। শেষ পর্যন্ত হাতে রইল আধখানা বিস্কুট। একজন সেটুকু চেয়ে নিয়ে গেল। বদলে দিয়ে গেল একখানা থলি। বলে গেল—এই থলির কাছে যা চাইবে তাই পাবে। জ্যাক চুরুট চাইল, আর হুইস্কি, আর কিছু খাবার। সে তখন মনের আনন্দে শহরের দিকে চলল। সেখানে গিয়ে দেখে তার পরিবারের কেউ বেঁচে নেই। শহরময় হাহাকার। দোকান শূন্য কোথাও খাদ্য নেই। লোকেরা বলছে—শহরে শয়তানের দৃষ্টি পড়েছে। জ্যাক সবাইকে বলল—কোনও ভয় নেই। সবাই ভালোভাবে চল, সব পাবে। থলির কাছে চেয়ে নিয়ে সে সব শূন্য দোকান খাবারে ভরিয়ে দিল। কিন্তু পথে সে শয়তানের

পাল্লায় পড়ে গেল। ওরা তাকে একটা পোড়ো বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বলল— তোমাকে খাব। জ্যাক বলল—আমার থলিতে যা আছে তাই খেয়ে শেষ কর, তারপর আমাকে খাবে। শয়তানরা যেই থলিতে ঢুকল জ্যাক অমনি থলির মুখ বন্ধ করে দিল। তারপর থলিটিকে নিয়ে হাজির হল কামারশালে। সেখানে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে শয়তানদের সে মেরে ফেলল।

গল্পটির তাৎপর্য জিপসী বলতে চায়, এমন ক্ষমতাবান যে নেহাই আর হাতুড়ি, জিপসী তার অধিকারী। তাই নিয়ে সে এসেছে ইউরোপে। তোমরা তাকে পরখ করে দেখ। ইউরোপ সে পরীক্ষা নিয়েছে। একজন ঐতিহাসিক বলেন—গ্রিক আর ভারতের মধ্যে প্রথম যোগসূত্র স্থাপন করে ভারতের কড়াই কারিগররা। ওরা শিকলিগরও ছিল। তাছাড়া চিরুনি এবং চালুনিও তৈরি করত। আর একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন—ওরা তুরস্ক থেকেই ইউরোপে আসুক, আর যেখান থেকেই আসুক, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, ধাতুবিদ্যা ওরা আয়ত্ত করেছিল ভারতেই। জিপসী তবু ভলকানের কথা বলে নিতান্ত সে স্মৃতিভ্রষ্ট বলেই!

জিপসী সংগীত পাগল। তাদের হাতে হাতে বেহালা, খঞ্জনি ইত্যাদি। তাদের মুখে কথায় কথায় গান। একজন ইংরাজ লেখক ওদের সংগীতপ্রিয়তা সম্পর্কে এক অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি ব্রিটিশ বাহিনীর বাদকদলের পরিচালক ছিলেন। ইতালিতে মিত্রপক্ষ বন্দি করেছে কিছু জিপসীকে। ওরা শত্রু বাহিনীতে ছিল। একদিন তিনি দেখলেন, অদ্ভুতদর্শন এই বন্দিদল যেন খুবই মন মরা। তিনি ওদের কাছে গিয়ে বললেন—কী হয়েছে তোমাদের? কোনও অসুবিধা হলে আমাকে বলতে পার। একজন এগিয়ে এসে বলল—গাজো আর কিছু নয়, আমরা গানবাজনার অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছি। আমাদের মন মেজাজ মোটে ভালো লাগছে না। তুমি বলে-কয়ে আমাদের যদি দু চারটে প্যাকিং বাক্স জোগাড় করে দিতে পার, তবে খুব উপকার হয়। প্যাকিং বাক্স দিয়ে তোমরা কী করবে? জানতে চাইলেন সাহেব। লোকটি উত্তর দিল—আমরা যন্ত্র বানাব। পাগল না কী—মনে মনে ভাবলেন সাহেব। তবে নিজে তিনি গানের মানুষ, সুতরাং ওদের আরজি মতো প্যকিং বাকস দিয়ে দিলেন। দিন কয়েক পরে সেখানে গিয়ে তিনি যা দেখলেন, তাতে চক্ষু স্থির। সত্যি সত্যিই কিছু বেহালা বানিয়ে নিয়েছে ওরা। মনের আনন্দে তা-ই বাজাচ্ছে গলা ছেড়ে গান গাইছে। বন্দি শিবির যেন জলসাঘর। সাহেব সেই থেকে জিপসীর বিশেষ অনুরক্ত। ওদের সঙ্গে নানা দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি পরবর্তীকালে।

—কোথায় পেলে তোমরা এই বেহালা? প্রশ্ন করলে সঙ্গে সঙ্গে গল্প জুড়বে পশ্চিমের জিপসী :

সে অনেক দিন আগের কথা। কোনও এক বনের ধারে একটি পরিবারের বাস। ওদের একটি মেয়ে ছিল। নাম ছিল তার মারিয়া। অপূর্বসুন্দরী কন্যা-দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। যে দেখে, সেই ঠায় দাঁড়িয়ে যায়। মারিয়া গরবিনী। সে কারও দিকে ফিরেও তাকায় না। হঠাৎ এক কাণ্ড। সেই বনের ধারে এসে হাজির এক গাজো যুবক। রাজপুত্রের মতো চেহারা। দুজনের মধ্যে কার রূপ বেশি, চট করে বলা শক্ত। মারিয়া তাকে দেখা মাত্র প্রেমে পড়ে গেল। কিন্তু এই ছেলেটি ফিরেও তাকাল না একবার। সে নিজের পথ ধরে চলে গেল। মারিয়া মনে খুব ব্যথা পেল। সে প্রতিজ্ঞা করল, যে করে হোক এই তরুণের ভালোবাসা পেতে হবে। এই ভেবে সে 'বেং'এর আরাধনায় বসল। 'বেং' হল শয়তান।

মারিয়ার ডাকে সে সাড়া দিল। শয়তান বলল—এই ভালোবাসার জন্য তুমি আর সব হারাতে রাজি? মারিয়া বলল—হ্যাঁ, রাজি।—তুমি তোমার মা-বাবা আর চার ভাইকে হারাতেও রাজি? মারিয়া বলল—হ্যাঁ, এ তরুণকে যদি পাই তবে তাতেও রাজি। শয়তান তখন ওর বাবা, মা আর ভাইদের বেহালায় পরিণত করল। বাবা হলেন কাঠের অংশটুকু—সাউন্ড বক্স ইত্যাদি। মা হলেন—বেহালার ধনুক, আর চার ভাই চারটে সরু তার!

জন্ম নিল বেহালা। তার সুর টেনে আনল উদাসীন যুবককে। মারিয়া আর তার প্রেমিক নিভৃতে মিলিত হয়েছে, এমন সময় শয়তান এসে হাজির। সে বলল—তোমরা আমার অনুচর। ভালোবাসার জন্য যে মা বাবা এবং ভাইদের মৃত্যু পর্যন্ত আনন্দে মেনে নিতে পারে, এ দুনিয়ায় তার বা তার ভালোবাসার মানুষের ঠাঁই হতে পারে না! সুতরাং তোমরা চল আমার সঙ্গে। বেহালা সেখানেই পড়ে রইল। শয়তানের সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা। কিছুদিন পরে এক জিপসী যাচ্ছিল সেই পথ দিয়ে। তার চোখে পড়ল যন্ত্রটা। সে তা কুড়িয়ে নিল। সেই থেকে বেহালা আমাদের সঙ্গী। দেখছ না, বেদনা আর ভালোবাসা—এর তারে দুই সুরই বাজে।

হয়তো গল্পের শেষে জিপসী একটা দুঃখের গানও শুনিয়ে দেবে :

না জানভ দাদ মিরো হ্যাজ,
নিকো মালেন মাঙ্গে হ্যাজ;
মিরো গুলে দাই মেরদিয়াস,
পিরানি ম্যান প্রিগ্রেলিয়াস;
য়ুভ তু হেগেদিভ
তুত সাল পাস মানগে...

দীর্ঘ গান। এরপরও আরও কয়েকটি ছত্র আছে। গদ্যে তার বক্তব্য—আমি

আমার বাবাকে দেখিনি। এই দুনিয়ায় আমার কোনও বন্ধু নেই। বহুকাল আগে আমার মা মারা গেছেন। যে মেয়েটিকে আমি ভালোবাসতাম, সেও রাগ করে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। এখন হে আমার বেহালা, একমাত্র তুমিই এই দুনিয়ায় আমার সঙ্গী।... আর বেহালারও বন্ধু আছে দুটি। তারা আমার মজ্জা কুরে কুরে খায়। তাদের একটির নাম ভালোবাসা, আর একটি ক্ষুধা।

গান শেষে জিপসী হয়তো বেহালার উলটো পিঠে সাঁটা একটি তরুণীর ছবি দেখিয়ে বলবে—এই আমার হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসা। জিপসী 'গাজো' বা যারা জিপসী নয়, তাদের কাছে মিথ্যা বলতে নাকি বিন্দুমাত্র ইতস্তত করে না। 'গাজো'কে ফাঁকিতে ফেলা তার নাকি এক মজার খেলা। নতুন বেহালাকে সে হামেশাই নাকি পুরনো দুর্লভ বেহালা বলে চালিয়ে থাকে। বেহালার জন্মের এই কাহিনিটাও অতএব একমাত্র কাহিনি বলে গ্রহণ করার কোনও প্রয়োজন নেই। কেননা, গবেষকেরা জানিয়েছেন—বেহালা নামক বাদ্যযন্ত্রটির জন্ম ইউরোপে নয়, প্রাচ্যে,—ভারতে। কোনও কোনও গবেষক এমনকি গিটারেও সেতার কিংবা তাম্বুরার ছায়া দেখতে পান। তাছাড়া জিপসীর নাচে গানেও এখনও নাকি খুঁজে পাওয়া যায় ভারতকে। তার গানে পশ্চিম ভারতীয় লোকসংগীতের রেশ, নাচে কোনও কোনও ভারতীয় নৃত্যের ভঙ্গি। জিপসী নর্তকীর যে দেহভঙ্গি দেখে থেকে থেকে বিলাসী দর্শকের তপোভঙ্গ হওয়ার উপক্রম, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আসলে তা কোনও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক নৃত্য ছিল। হাঙ্গেরি এবং স্পেনের সংগীতে জিপসীর নাকি প্রভূত অবদান। বস্তুত কোনও কোনও লেখক মনে করেন, হাঙ্গেরির গান জিপসীর দৌলতেই পুনরুজ্জীবিত। অবশ্য এ সম্পর্কে বিতর্কও আছে। কিন্তু কোনও তর্ক নেই জিপসীর হাতের এই বেহালা এবং তার নাচের ছন্দ নিয়ে। এই সেদিনও যুগোশ্লাভিয়ায় জিপসী মেয়ে নেচে নেচে গৃহপালিত পশুর বন্ধ্যাত্ব ঘোচাত, বুলগেরিয়ায় রূপবতী জিপসী কন্যা নেচে গেয়ে বৃষ্টি নামাত। নর্তকী জিপসীর পায়ের আঘাতে আর ঘুঙুরের বোলে মাটির ঘুম ভাঙে, রুক্ষ ধরিত্রী ধীরে ধীরে রসবতী হয়ে উঠে, তার বুকে জেগে ওঠে ফসলের সমারোহ।

জিপসী গায়ক আর নর্তকী যে আদিতে ভারতের সন্তান, তার প্রমাণ মেলে কবি ফিরদৌসির (Firdusi) 'শাহনামা'র (১০০০ খ্রিস্টাব্দে) পাতা ওলটালেও। তাতে আছে পারস্যরাজ বেহরাম গৌর (Behram Gour) হঠাৎ স্থির করলেন, তিনি প্রজাবর্গকে নৃত্যগীতে আপ্যায়ন করবেন। নাচ গানের অভাবে ওদের জীবনে কোনও সুখ নেই। খালি কাজ আর কাজ। একঘেয়েমিতে ওরা ক্লান্ত। বেহরাম মনে মনে ভাবলেন—এটা ঠিক নয়। ওদের মুখে হাসি ফোটানো দরকার। তাই নাচ গানের

চিন্তা। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে এত গায়ক আর নর্তকী? ভেবেচিন্তে তিনি ভারতের রাজা এবং কম্বোজের সম্রাট শংকলের (Shankal) কাছে অনুরোধপত্র সহ এক প্রতিনিধি দল পাঠালেন। সে অনুরোধ রক্ষা করতে ভারত থেকে বারো হাজার নারী পুরুষ এসে পৌঁছাল পারস্যে। তারা গায়ক এবং নর্তকী। বেহরাম রাজ্যের একটা এলাকা তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিলেন। তাদের প্রত্যেকে তিনি জমি দিলেন, শস্য বীজ দিলেন, গৃহপালিত পশুও দিলেন। শর্ত : নাচ-গানের জন্য তারা কিছু পাবে না; এই জমি থেকেই তাদের চালাতে হবে। কিন্তু বছর শেষে দেখা গেল, জমি তেমনই পড়ে আছে। বীজ ও শস্য ওরা খেয়ে নিয়েছে। বহরাম তখন রেগে গিয়ে আদেশ দিলেন—ওদের গাধা এবং বাদ্যযন্ত্র সব কেড়ে নাও। এবার রাজ্যময় ঘুরে ঘুরে ওদের গাইতে হবে, নিজেদের খাদ্যের সংস্থান নিজেদের করে নিতে হবে। ফিরদৌস লিখছেন—সে কারণেই 'লুরি'রা দুনিয়াময় কুকুর আর নেকড়ে বাঘ সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। চুরি-ডাকাতি করে দিন কাটায়।

ফিরদৌসিদের এই বিবরণকে সমর্থন করেছেন আরবী ঐতিহাসিক হামজাও (Hamza)। ৯৪০ খ্রিস্টাব্দে লেখা তাঁর বিবরণেও ভারত থেকে আগত 'লুরি'দের বিচিত্র জীবন-কথা।

শুধু সুর আর দেহ-ছন্দে মানুষের জন্য মায়ালোক রচনা নয়, জিপসীর কাছে বশ মেনেছে অরণ্যের প্রাণীও। ঘোড়ার প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণের কথা আগেই বলা হয়েছে। ঘোড়া আর সব যাযাবর সম্প্রদায়ের মতোই জিপসীর কাছে প্রিয়তম প্রাণী। মধ্যযুগের পৃথিবীর গতি বহুলাংশে এই ঘোড়ার পিঠেই। দেশ থেকে দেশে, এক মহাদেশ থেকে অন্য দেশে অভিযাত্রা কিংবা অভিযানে সব ঘোড়ার খুরে ভর করেই। জিপসীর কাছে ঘোড়া যেন জন্তু নয়, অন্য কিছু। জিপসী তার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলে, যেন কোনও মানুষ বন্ধুকে বলছে। সে কাউকে 'সুখে থাক' বলে না, বলে—'তোমার ঘোড়া দীর্ঘজীবী হোক!' ঘোড়ার সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক জিপসীর, তবু সে কিন্তু ভাল ঘোড়সওয়ার নয়। জিপসীর কাছে ঘোড়া প্রধানত ভারবাহী, কিংবা মনের আনন্দে কেনাবেচা করার মত পণ্য। একমাত্র ব্রিটেনে নাকি রেসের মাঠে কিছু কিছু জিপসী 'জকি' বা সওয়ার দেখা যায়, আর সব দেশে ওরা ঘোড়ার সওদাগর। ইউরোপের মেলায় মেলায় ওরা ঘোড়া কেনে ও বেচে। এক হাটে চাষীর রুগ্‌ণ ঘোড়াটি সস্তায় কিনে, তার কাছেই চড়া দরে বিক্রি করে দেবে জিপসী। ঘোড়ার জারিজুরি তার যেমন মুখস্থ, তেমনি খদ্দেরের মনের খবরও নাকি ওদের সব জানা। তার কাছে আর সব ঘোড়ার কারবারি হার মেনেছে অনেক কাল।

কোনও কোনও গবেষকের ধারণা, ঘোড়ার ব্যাপারী হয়েছে জিপসী হাঙ্গেরির

সমতলে পৌঁছানোর পরে। কিন্তু অন্যরা মনে করেন, এই বিশিষ্ট প্রাণীটির সঙ্গে জিপসীর ঘনিষ্ঠতা সেই সিন্ধু প্রদেশেই। এখনও পশ্চিম ভারতের কোনও কোনও অঞ্চল বুনো গাধা এবং ঘোড়ার সন্ধান মেলে। জিপসী যে একসময়ে তাদের ধরে পোষ মানাবার চেষ্টা করেনি তার প্রমাণ কী?

জন্তুকে পোষ মানাবার কাজে জিপসী যেন জাদুকর। বাঘ, সিংহ, ভালুক, বাদর কুকুর, ছাগল—সব জন্তু তার বশ। সার্কাসওয়ালাদের কাছে তাই জিপসীর খুব খাতির। ইউরোপের সার্কাসে জিপসীর অবদান খুব সামান্য নয়। একালে কিছু কিছু সার্কাসের মালিকও নাকি জিপসী। ক্রীড়ানৈপুণ্যের জন্য কোনও কোনও জিপসী মেয়েরও যথেষ্ট নামডাক। চিড়িয়াখানার পরিচালকরাও জীবজন্তু সম্পর্কে অনেক সময় ওদের পরামর্শ নেন, জন্তু জানোয়ারের তদারকির জন্য কেউ কেউ জিপসীকে নিয়োগও করেন। তবে তাদের খবর সবাই রাখে না। সাধারণ পাঁচজনের কাছে জিপসী ভালুক নাচাবার ওস্তাদ! ইউরোপে বিশেষ করে পূর্ব এবং মধ্য ইউরোপের দেশে দেশে এখনও মাঝে মাঝে শোনা যায় ডুগডুগির বাদ্য, ছেলে বুড়ো মন্ত্রমুগ্ধের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে যায়। জিপসী সুর করে বলে—আজদে মালো, মার্টিনে, দা পইগ্রাস!—নাচ রে মার্টিন, একটু নাচ!···

—এ ভালুক কোথায় পেলে তোমরা?

পাইপে আগুন ধরিয়ে মুচকি হাসবে বাজিকর।— সে অনেক কথা। আমাদেরই একটি কুমারী মেয়ে হঠাৎ একদিন জানল, সে মা হতে চলেছে। অথচ, মেয়েটি খুবই সচ্চরিত্রের, সে কোনও দিন কাউকে ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। মনের দুঃখে বেচারা জলে ঝাঁপ দিতে চলল। জলের নীচ থেকে হঠাৎ আবির্ভূত হলেন এক দেবতা। তিনি বললেন—খবরদার, এ কাজ কোরো না। যে আসছে তাকে আসতে দাও, তোমাদের কল্যাণ হবে। জিপসীরা তাঁর কথামত অপেক্ষা করে রইল। যথা সময়ে কুমারী মা জন্ম দিল এক অদ্ভুত দর্শন শিশু। সে মানুষের মতো দু'পায়ে হাঁটতে পারে আবার জন্তুর মতো চার পায়ে ছুটতেও পারে। আমরা তাকে সানন্দে কোলে তুলে নিলাম। সেই সন্তানই ভালুক।

এ জাতীয় গল্প আমাদের দেশের বাজিকরদের মুখেও শোনা যায়। সুতরাং জিপসী ভালুকের নাকে দড়ি পরিয়েছে বলকান এলাকায়, এমন মনে করার কোনও কারণ নেই।

জিপসী হাত দেখে। অন্য লোকের ভাগ্যগণনা তার আর এক পেশা। এ কাজটা অবশ্য বিশেষ ভাবে মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত। ওরা চিররহস্যময়ী এ বিদ্যা ওদের অধিকারে থাকাই ভালো। এক সময় খ্রিস্টানী দুনিয়ার হাত দেখা বা ভাগ্যগণনা

করে একধরনের তাসও। তাকে বলে—'তারোত' (tarot)। তাস খেলার চল হয়তো জিপসীর দেশত্যাগের সময়ে ভারতেও ছিল। কিন্তু এই বিশেষ ধরনের তাস সে পেয়েছে নাকি আসিরিয়ানদের কাছ থেকে। একটা বাণ্ডিলে তাস থাকে আটাত্তরখানা। সেগুলো দেখতেও সাধারণ তাসের চেয়ে অনেক বড়। তাতে যে সব ছবি বা নকশা আঁকা থাকে তাও অন্যরকম। এ তাস নাকি ইউরোপে নিয়ে যায় জিপসীরাই।

হতে পারে। আর সব জনগোষ্ঠীর মতোই জিপসীও নিশ্চয় অন্যদের থেকে বিস্তর গ্রহণ করেছে, নিজের ধ্যান ধারণা দান করেছে অন্যদেরও। আজ আর সব কথা তার মনে নাই। এটুকই সে জানে, তাকে বাঁচতে হবে। তার জন্য যদি দরকার হয় দু'চারটে মিথ্যে কথা বলতে সে সানন্দে রাজি। জিপসী কখনও যেমন অন্য জিপসীর কাছে ঘোড়া বিক্রি করে না, ঠিক তেমনই জিপসী মেয়ে কখনও অন্য কোনও জিপসীর হাত দেখতে বসে না। এসব বিদ্যা তার নগদের বিনিময়ে ফিরি করার, সুতরাং খদ্দেরের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য অনায়াসে তাকে মনগড়া নানা কথা বলে সে ত্রস্ত পায়ে হেঁটে চলে নিজেদের ছাউনির দিকে। সারাদিনের পথশ্রম, উপরোধ, অনুরোধ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা পুরস্কার সবই তার এই সন্ধ্যাটির জন্য। কান পাতলে শোনা যাবে, ঘরে ফিরে জিপসী মেয়ে গৃহস্থালি কাজের মধ্যেই গুন গুন গান গাইছে। খুশিতে উচ্ছ্বসিত জীবনের গান। সে গানের মর্ম : আমার মা ছাউনিতে নেই। সে গেছে শহরে। আমার বাবা হাসপাতালে পড়ে আছে। বোনটাও বাড়ি নেই। ভাইরা সব পাশের তাঁবুতে খেলছে। বন্ধু, আমি এখন একাকিনী তোমারই অপেক্ষায়।··· আমি আজ একটি বড় ঘরের মেয়ের হাত দেখেছি। কোনও জিপসী মেয়ে কখনও এমন বুদ্ধির খেলা দেখাতে পারবে না। আমি তাকে বলে এসেছি—একদিন কোনও লর্ডের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। তার যেমন রূপ, তেমন ধনদৌলত। শুনে খুশি হয়ে মেয়েটি আমার হাতে একমুঠো মুদ্রা গুঁজে দিয়েছে। তুমি তো জান বন্ধু আমি ওদের সঙ্গে খুশিমতো বকবক করি, কথায় ওদের মন ভিজিয়ে দিই।—তুমি তো জান বন্ধু সে শুধু তোমারই জন্যে তোমার ভালোবাসা পাব বলে।

হয়তো এই ছাউনির অদূরে আর এক ছাউনিতে একটি তরুণ তখন গলা ছেড়ে গাইছে :

তু সান ই কোনে আদ্রে ও হেড,
মার দিয়ারি, কামেলা বানি
তে ওয়াভের ফোকি সান ও ভাভ্,
কোন্ গাঙলা তুত ফন্ মেনি।

—হে আমার প্রিয়তমা আকাশে ধীরে ধীরে চাঁদ ভেসে চলেছে। সে যেন তুমি—তুমি। মেঘগুলো সব অন্য মানুয। তারা তোমার চাঁদের মতো মুখখানা ঢেকে রেখেছে!

ভালোবাসা।

জিপসী জীবনকে ভালোবাসে। সে সাজতে ভালোবাসে, হাসতে ভালোবাসে। ভালোবাসে ভালোবাসতে।

স্বদেশে অভিজাত কিংবা উচ্চবর্ণের পোশাকে অধিকার ছিল না এদের। ভিখারি ছেঁড়া কাপড়েই রাজা সেজেছিল। রঙিন পাগড়ি, রং বেরঙের পুঁতির মালা, কুড়িয়ে পাওয়া এটা সেটা আর সস্তা মুদ্রার গহনায় তরুণ নট যেন রাজকুমার। মেয়েরা শাড়ি পরতে পারে না, ঘাঘরা পরে। গোড়ালি অবধি নেমে যাওয়া ঝালরওয়ালা সাত প্রস্থ কাপড়ের মনোহর নিম্নবাস। চলার পথে ঢেউ খেলে। ঊর্ধ্বাঙ্গে সে তুলনায় আয়োজন অতি অল্প। কেননা, জিপসী কন্যা অন্তে নিজেকে জননী বলে ভাবতেই শিখেছে। প্রকাশ্যে সন্তানকে সে যেমন স্তন দানে ইতস্তত করে না, তেমনি গর্বিতা জিপসী তরুণী তার যৌবন মহিমা গোপন করার কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজে পায় না। এমন দৃশ্যও নাকি দেখা গেছে, প্যারিসের পথে হাজার চোখের সামনে জিপসী কুমারী তার বুকের চোলি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কলের জলে দেহ মার্জনা করছে! মেয়েদের বুক সম্পর্কে 'গাজোর' দৃষ্টিভঙ্গি নাকি জিপসীরা এখনও বুঝে উঠতে পারে না। মেয়েরা পর্যন্ত তাই নিয়ে নাকি নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে। জিপসীর চোখে নারীদেহে বুকের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় নাকি পা, ঊরু আর তলপেট। জিপসী মেয়ের স্কার্ট যে প্রায় রাস্তা ঝাড়ু দেয় সে নিছক ফ্যাশনের জন্য নয়।

স্কার্ট ধরেছে ওরা অনেক পরে। ইউরোপীয় এই পোশাকটি তারা নিয়েছে হাঙ্গেরি থেকে। তবে সবাই নয়। অনেক জিপসী মেয়ে একালেও ঘাঘরাতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করে। জুতো পরতে আরম্ভ করে তারা নাকি আরও অনেক পরে, পায়ে পায়ে অনেক বরফ মাড়িয়ে, এই একালে পৌঁছে। গহনার বেলায় কিন্তু তা বলার উপায় নেই। অঙ্গাভরণে জিপসী মেয়ে চিরকালের রূপসাধিকা। হাতের প্রতি আঙুলে আংটি পরতেও তার আপত্তি নেই। আংটি পরে ওরা পায়েও। রং বেরঙের চুড়ি, বালা ইত্যাদি অনেক সময় কবজি থেকে শুরু করে কনুই ছাড়িয়ে উঠতে থাকে; গলায়

হারও যেন যথেষ্ট নয়। কোনওটি তার পুঁতির মালা, কোনওটি রুপোর, কোনওটি হয়তো বা নানা দেশ থেকে জোগাড় করা নানা কালের মুদ্রার ছড়া। তার পরও আছে কানে মস্ত মস্ত রিং কিংবা ঝুমকো, নাকে নাকছাবি। কেউ কেউ উলকিও পরে। এইসব গহনা আর উলকির মধ্যে কোনও কোনওটি অবশ্য জাদুগুণ সম্পন্ন। কিন্তু বাদবাকি সব অঙ্গসজ্জা মাত্র। চলেছে জিপসীকন্যা, যেন চলমান কোনও প্রদর্শনী। অথচ মজার কথা এই, জিপসীর ওই পোশাক কিন্তু গাজোর হাট থেকেই কিনে নেওয়া। ওদের মধ্যে নানা পেশার লোক আছে, কিন্তু তাঁতি নেই। ওরা আমাদেরই তৈরি পোশাকে সাজে। পছন্দটাই শুধু নিজেদের। কিন্তু সত্যিকারের দর্শনীয় কী, এই পোশাক আর অলংকার, না এত আয়োজনও যার অঙ্গের স্পর্শে নিষ্প্রভ— সেই মেয়েটি!

হাজার অপরিচিতের হাটে গেয়ে চলেছে জিপসী মেয়ে : হতে পারে আরও সুন্দরী আছে এই দুনিয়ায়। থাকতে দাও। এদেশে আমার মতো কেউ নেই। গাছ থেকে খসে পাতা নদীতে পড়ে। পড়ে ভেসে যায়। তেমনি আমার ঠোঁটে প্রতিদিন হাজার চুম্বন আসে, চলে যায়—হে বন্ধু তুমি এসো। তার গলার সুরে ও স্বরে, দেহের ভঙ্গিতে চোখের চাউনিতে যেন গোটা পৃথিবীর তরুণের জন্য নিমন্ত্রণ। জাতিভেদ, শ্রেণিভেদ, সমাজভেদ লোপ পেয়ে যেতে চায়। আনমনা পথিক থমকে দাঁড়ায়। নাচ শেষে কেউ বা সর্বস্ব তার হাতে তুলে দিতে চায়, কেউ বা অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে আপন পথ ভুলে নিঃশব্দে পিছু পিছু হেঁটে যায়। মেয়েটি যেন তার হৃদয়খানা হাতে নিয়েই চলেছে। সামনে যাকে পাবে তাকেই দিয়ে দেবে। স্বপ্নজাল বোনা শেষ হতে না হতে, হায়, জিপসী মেয়ে পলকে ছায়ার মতো কোথায় যেন হারিয়ে যায়। ক্ষ্যাপা গোর্গিও খুঁজে পায় না তাকে।

ইতিমধ্যে আপন আস্তানায় ফিরে এই মেয়েটিই হয়তো মায়ের কাছে গর্ব করে বলছে—জানো মা, আমি এই শহরের সেরা সুন্দরী।—কী করে জানলি? জিপসী গানে মায়ের জিজ্ঞাসা।—আমাদের ঘরে তো আরশি নেই। সুরে সুরেই উত্তর দেয় মেয়ে—তা বটে, তবু আমি সবসেরা সুন্দরী। পথে সাদা মানুষেরা তাই যে বলল আমাকে!—কী করে তাদের কথা বুঝলি তুই?—তুই যে জিপসী মেয়ে। আবার প্রশ্ন করে মা।—না মা, ওরা কেউ কথা বলেনি। উত্তর দিল মেয়ে। ওদের চোখের আগুনই আমায় বলে গেল সে কথা। গান শেষে মা আর মেয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে এক সঙ্গে।

'জিপসীর হৃদয় হাতে থাকে' একথা মিথ্যে নয়। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, সে শুধু জিপসীদেরই জন্য। প্রেম, বিয়ে এবং পারিবারিক জীবনে জিপসীরা

অত্যন্ত গোঁড়া। ভারতীয় সমাজের মতোই এসব ব্যাপারে তাদের মধ্যে নানা বিধির কড়াকড়ি নানা নিয়ন্ত্রণ। অবশ্য সম্প্রদায় ভেদে কিছু কিছু রীতিভেদ আছে। কিন্তু একটি বিষয়ে সব সম্প্রদায়ই মোটামুটি এক মত যে, ভালোবাসা এবং বিয়ে আপন সম্প্রদায়ের পরিধির মধ্যেই বাঞ্ছনীয়। জিপসী মেয়ে বা ছেলের পক্ষে রাগ অনুরাগ তথা ভালোবাসার খেলা নিষিদ্ধ নয়। ছেলেরা বিশেষ মেয়ের মন পাওয়ার জন্য নানা ভাবে সাধনা করতে পারে। মেয়েরাও। ওরা নানা তন্ত্রমন্ত্রও কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। বশীকরণের নানা ব্যবস্থাপত্র রয়েছে 'দ্রাব্রারনি' (drabrarni) বা ওষুধওয়ালির কাছে। একটি ব্যবস্থা : মেয়েটি যদি কিছুতেই ধরা না দিতে চায়, তবে একা নিঃশব্দে চলে যাও নদীর কাছে। গাছ থেকে একটি পাতা ছিঁড়ে নাও। ছুরি দিয়ে কবজি থেকে রক্ত বের করে পাতাটায় লাগাও। লাগাবার সময় মনে মনে নিজের নাম বলো। আবার ছুরি চালাও। এবার রক্ত মাখাতে হবে পাতার উলটো পিঠে, এবং নাম বলতে হবে মেয়েটির। এই অনুষ্ঠান শেষে পাতাটি নদীর জলে ছুঁড়ে দাও, দেখবে সে মেয়ে নিজে থেকে এসে তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে!

মেয়েরাও ছেলেদের মন পাবার জন্য নানা অদ্ভুত অনুষ্ঠান করে। নায়কের বালিশের তলায় গোপনে কবরের মাটি রেখে দেওয়া, চতুর্থীর রাত্রে চৌরাস্তায় নানা বস্তুতে গড়া পুতুল পুঁতে রাখা, বিশেষ কোনও মন্ত্রপূত জিনিস খাইয়ে দেওয়া—ইত্যাদি হরেক কাণ্ড। প্রার্থী যখন অনেক, এবং নায়িকা যখন কিছুতেই মনঃস্থির করতে পারছে না, তখন আবার লটারির বন্দোবস্ত। এক এক জনের প্রতীক হিসাবে একটি করে ময়দার বল তৈরি করে সে ছুড়ে দেয় আগুনে। তারপর বান্ধবীকে সাক্ষী রেখে টেনে নেয় একটি। যে প্রথমে হাতে এল, সেই তার মনোনীত। আর সকলের আরজি খারিজ। তারপরও যদি দ্বিতীয় কোনও তরুণ এসে সে মেয়ের সঙ্গে বসে কথা বলে, প্রথম তরুণ তখন অনায়াসে সেখানে গিয়ে মেয়েটির চুলের বাঁধন অলগা করে দিতে পারে। অর্থাৎ অন্যকে জানিয়ে দিতে পারে, এ মেয়ের উপর একমাত্র আমার অধিকার। মনোনয়নের প্রথার রকমফেরও আছে। ময়দার গোলাগুলোর মধ্যে কাগজে নায়কের নাম লিখে তা পুরে ফেলে দেওয়া হয় ফুটন্ত জলে। প্রথমে যেটি ভেসে ওঠে, সেটি তুলে নিয়ে জানতে হবে স্বয়ংবরা নিজেকে সমর্পণ করবে কার কাছে।

এক এক সম্প্রদায়ে এক এক আচার। তবে সব জিপসী তাঁবুতেই এক কথা—বিয়ে পর্যন্ত কুমারী ব্রত। জিপসী মেয়ের বিয়ে হতে পারে তিন ভাবে। এক অপহরণ। তার সম্মতিতে কেউ যদি তাকে তুলে নিয়ে যায়, তবে পরিবারে

উত্তেজনা দেখা দেয়, বটে, কিন্তু বর কনে ফিরে এলে সব গোল মিটে যায়। বলপূর্বক অপহরণ করা হলেই সমস্যা। তবে সে মেয়েকে আটকে রাখা শক্ত। সে পালিয়ে আসবেই। দ্বিতীয়—কনে কিনে নেওয়া। বিয়ে করতে হলে জিপসী ছেলেকে পণ দিতে হয় কনের বাবাকে। সে বিয়ে সম্পর্কে কথাবার্তা চালাবার দায়িত্ব ছেলের বাবার। মেয়ের বাবা বেশি টাকা চাইতে পারে সে কারণে বিয়ে ভেঙেও যেতে পারে। অবশ্য ছেলে আর মেয়ের মধ্যে যদি পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকে তবে অন্য কথা, ওরা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে পারে। ফিরে এসে একটা ভোজ লাগিয়ে দিতে পারলেই হল! সুতরাং এসব দেখেশুনে একালে অভিভাবকরা বিয়ের কথা পাকা করার আগে ছেলে ও মেয়ের মতামত নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করে। অন্য দুই ধরনের বিয়ের চেয়ে তৃতীয় এই ব্যবস্থাটাই ইদানীং জনপ্রিয়। ছেলে কৌশলে মা বাবাকে আপন পছন্দের কথা জানিয়ে দেয়। বাবা কাকারা সময় বুঝে মেয়ের অভিভাবকদের কাছে কথা পাড়ে। কনে বাছাই ব্যাপারে জিপসী সংসারে প্রবাদ—পুত্রবধূ পছন্দ করতে হয় চোখ দিয়ে নয়, কান দিয়ে। অর্থাৎ মেয়েটি সম্পর্কে পাঁচজনে কী বলে তাই শুনে। আর একটি জিপসী প্রবাদ—রূপ চামচ দিয়ে খাওয়া যায় না। এক সময় নাকি কোনও কোনও জিপসী গোষ্ঠীতে প্রথা ছিল, মেয়ে যৌবনে পা দেওয়ার পর প্রথম যে তরুণ তার সামনে পড়বে, সে মেয়ের উপর তার অধিকার। আজকাল ওসব নিয়ম তামাদি হয়ে গেছে। তবে জিপসী ছেলে মেয়েদের এখনও কম বয়সেই বিয়ে হয়। মেয়েরা তেরো-চোদ্দয় গৃহিণী ছেলেরা পনের-ষোলোয় দায়িত্বশীল স্বামী।

বিয়ের পর বর কখনও কখনও কনের পরিবারে থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কনেকে শ্বশুরের ঘর করতে হয়। কোনও কারণে বনিবনা না হলে মেয়ে আবার ফিরে যায় বাবার সংসারে। জিপসীদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ খুব কম—কালেভদ্রে এক আধটা। জিপসী স্বামী স্ত্রী সাধারণত পরস্পর সারা জীবনের সঙ্গী।

ওদের বিয়ের অনুষ্ঠান সাদাসিধে। তবে ভোজের আয়োজন বিপুল। দূর দূর জায়গা থেকে ছুটে আসে আত্মীয়রা। মেলার পরিবেশ। বিস্তর মদ্য মাংস উড়ে যায়। অনেক সময় উড়ে যায় এক জীবনের সঞ্চয়। জিপসীরা বলে—জীবন মোমবাতি নয়, সবটাই শিখা! জিপসীর প্রিয় পানীয় চা আর বিয়ার। কিন্তু উৎসবের দিনে 'তাতাপানি'তেও তার আপত্তি নেই। হুইস্কি, ব্রান্ডি— সেদিন সব চলে। শত্রু সেদিন মিত্র হয়ে যায়। কারও কোনও খেদ নেই, ক্ষোভ নেই, সবাই আনন্দ সাগরে ভাসমান।

জিপসী রুটি খায় কম, তার প্রিয় খাদ্য—ভুট্টা। মাংসের মধ্যে প্রিয় মুরগি আর শজারু। অন্য মাংসও ওরা খায়, কিন্তু ঘোড়ার মাংস অস্পৃশ্য। কোনও কোনও জিপসী গোষ্ঠী ভাতও ভালোবাসে। উৎসব অনুষ্ঠানে তারা নাকি বিরিয়ানি রাঁধে। তবে ভারতীয়দের মতো এরা এত মশলা খায় না। বিয়ের ভোজসভায় বিশেষ সমাদর মুরগি আর রোস্ট করা শূকরের মাংস। আর সব শেষ হয়ে গেলে পর ঘরে তৈরি কেক আর মিষ্টি। সিগারেট আর চুরুটের ধোঁয়ার আসর তখন আচ্ছন্ন। খাওয়াদাওয়া, হল্লা চলে কয়েকদিন ধরে।

বিয়েতে পুরোহিত লাগে না। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করে দলপতি। বরকনেকে পরস্পরের হাত ধরে তার সামনে দাঁড়াতে হয়। কোনও কোনও সম্প্রদায়ে মাটিতে হাঁটু গেড়ে তাকে প্রণাম জানাতে হয়। অনুষ্ঠানে মালা বদলের পরিবর্তে রুটি বদল হয়। দলপতি রুটি দু'ভাগ করে তাতে একটু করে নুন দিয়ে তুলে দেন বর কনের হতে। বলেন যেদিন এই নুন রুটি তোমাদের মুখে বিস্বাদ ঠেকবে, সেদিন জানবে তোমরা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণও হারিয়েছ। রুটি মুখে দেওয়ার আগে তা বদল করে নেওয়াই নিয়ম।

তাই বলে কী জিপসী তরুণ-তরুণীর দৃষ্টি চিরকাল নিজেদের সমাজের চৌহদ্দিতেই বাঁধা। সীমাহীন পৃথিবীর পথিক ওরা। ভালোবাসার খেলাতেই বা বরাবর বাঁধা সড়ক ধরে হাঁটবে কেন? পৃথিবীর আর সব মানুষের মতোই জিপসীও কখনও কখনও সমাজের কাঁটাতারের বেড়া ভেঙে বেরিয়ে আসে। তবে সে একমাত্র ভালোবাসার হাতছানিতেই। সত্যিকারের জিপসী কখনও অর্থের বিনিময়ে শরীর ফিরি করার কথা ভাবতে পারে না। ইউরোপের নানা শহরে কিছু কিছু জিপসী রূপোপজীবিনীর কথা শোনা যায়। কিন্তু ওরা নাকি আসলে সাজানো জিপসী। জিপসীর প্রতি 'গাজো'র আকর্ষণকে নগদে ভাঙিয়ে নেওয়ার জন্যই নাকি এসব ফন্দি ফিকির। জিপসী বারবনিতা যদি একান্তই কোথাও থাকে, তবে তাকে বিশেষ ব্যতিক্রম বলে ধরে নেওয়াই সঙ্গত। তবে হ্যাঁ, 'গাজো'র ভালোবাসা জিপসীকে ঘরছাড়া করতে পারে বইকি! ইসাবেলা আর ষষ্ঠ চার্লসের ভালোবাসা না হয় উপন্যাস, কিন্তু বাস্তবে এমনি হৃদয় দেওয়া নেওয়ার ঘটনাও অবশ্যই ঘটে।

'গাজো'র সঙ্গে জিপসীর বিয়ে মানেই জিপসীর তাঁবুতে তাঁবুতে প্রবল উত্তেজনা। সে বিয়ে কোনও জিপসী খুশি মনে মেনে নিতে পারে না। সাধারণত, ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, সঙ্গে সঙ্গে তার জাত গেল, সে আর জিপসীদের কেউ না। ছেলেটি বা মেয়েটি যদি ইতিপূর্বে প্রমাণ করে থাকে যে,

জিপসীদের প্রতি তার ব্যবহার বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ, তাহলেও চট করে তাকে দলে নেওয়া হবে না। সে যদি তার পরিবার, সমাজ, সভ্যতা, সব ছেড়ে আসে, তবু না। খুব ধরাধরিতে পড়লে জিপসীরা তাকে ঠাঁই দিতে পারে বটে, তবে জিপসী হিসাবে নয়, সে হবে 'ফ্রাল' (Phral) —'ভাই'। অর্থাৎ জিপসীর দৃষ্টিতে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। অন্য জিপসীরা আড়ালে তার স্ত্রী তথা জিপসী মেয়েটিকে চিরকাল ঘৃণা করবে, তার নিন্দা করবে। কোনও জিপসী তরুণ যদি কোনও 'গাজো' মেয়ের হাত ধরে তাকে তাঁবুতে নিয়ে আসে, তবে সে বেচারারও দুর্দশার একশেষ। তাকে প্রতি পদে নানা গঞ্জনা সইতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, পরিবার পরিজন ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল যে জিপসী মেয়ে, মাথা হেঁট করে সে আবার ফিরে আসছে আপন ঘরে। শেষ পর্যন্ত কেউ কেউ থেকে যায়। রক্তবন্ধনে বাঁধা পড়ে ভবঘুরে জিপসী আর গৃহস্থ 'গাজো'।

'রক্ত-বন্ধন' জিপসীদের আর এক বিশেষ অনুষ্ঠান। আগে নাকি অন্য সম্প্রদায়ের কেউ জিপসী মেয়েকে বিয়ে করলে দুজনের কবজি থেকে রক্ত বের করে আনুষ্ঠানিক ভাবে দুজনের হাত একসঙ্গে বেঁধে সে মিলনের কথা ঘোষণা করা হত। আজকাল আর বিয়ের আসরে এ অনুষ্ঠান দেখা যায় না। তবে কেউ যদি ইচ্ছে করে বরাবরের জন্য জিপসীদের দলে যোগ দিতে চায়, তবে তার আগে নিতে হবে এই রক্তের প্রতিজ্ঞা। চার্লস পেইন নামে এক ইংরেজ একটি জিপসী মেয়েকে মৃত্যুশয্যা থেকে বাঁচিয়ে তোলেন। জিপসীরা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে—আমরা তোমাকে পুরস্কৃত করতে চাই, কী নেবে বলো। পেইন বলেন—আমি আর কিছু নয়, শুধু তোমাদের বন্ধুত্ব চাই। মেয়েটির প্রেমিক তখন ঘোষণা করে—গাজো, তোমার জন্যই আমি আমার প্রিয় রোমানিকে ফিরে পেলাম। এ ঋণ অর্থ দিয়ে শোধ করার মতো নয়। কিন্তু তুমি যা চাইছ, আমি তাও চাওয়ামাত্র তোমাকে দিতে পারি না। জিপসী কোনও গাজোকে তার খাওয়ার টেবিলে বসাতে পারে না। একমাত্র আমাদের ভাইবোনদেরই সে অধিকার আছে। সুতরাং তোমাকে আমাদের ভাই হতে হবে। তারপর সকলের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক রক্ত-বন্ধন। পেইন ওদের একজন 'ভাই' হয়ে গেলেন। তবে বলা নিষ্প্রয়োজন, তিনি পুরো জিপসী হতে পারলেন না, তাঁকে বলা চলে—'মনোনীত জিপসী'। জিপসী মা বাবার সন্তান যে নয়, সে কখনও সাচ্চা জিপসী নয়।

বিয়ের পর যে জিপসী বধূ মা হতে পারল না তার মতো অভাগী বুঝি আর হয় না। কোলে সন্তান পাওয়ার জন্য তার সে কি ব্যাকুলতা! কেননা, বন্ধ্যা মেয়ে অলুক্ষুণে তার সম্পর্কে প্রতিবেশীদের মনে নানা কুসংস্কার। এমনকি আপনজনও

সন্দেহের চোখে দেখে তাকে। সন্তান কামনায় জিপসী বউ তাই নানা ব্রত পালন করে। বিচিত্র সে সব আচার অনুষ্ঠান। আর একবার যদি মাতৃত্বের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখনও আবার হরেক অনুষ্ঠান। স্বামী থেকে শুরু করে দলের সবাই তার জন্য রীতিমতো ব্যস্ত সমস্ত। অনেক সময় তার চোখের সামনে দেখতে সুন্দর এমন কারও ছবি ঝুলিয়ে রাখা হয়। ওদের ধারণা, এ সময়ে মনের মধ্যে সে যেমন মূর্তি ধ্যান করবে, সেরকম সন্তানই ভূমিষ্ঠ হবে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে অশৌচ। তিন চার সপ্তাহ মাকে ছোঁয়া বারণ। সন্তানের আনুষ্ঠানিকভাবে নামকরণ না হওয়া অবধি মায়ের পক্ষে রান্না করা বা বাসনপত্র ছোঁয়া নিষিদ্ধ।

জিপসীর কাছে সন্তান অমূল্য ধন। আর পাঁচটা সমাজের মতো অবোধ যৌবন ওদের তাঁবুতে কখনও কখনও সংযমকে অন্ধকারে ছুড়ে দেয়, শরীর আইন অমান্য করে বসে। তার ফলে হয়তো কোনও কুমারী মা হতে চলেছে। তার ভাগ্যে অনেক সাজা, অনেক নিন্দা। বিবাহিত মেয়েদে মতো তাকে মাথায় রুমাল জড়াতে হবে, অর্থাৎ সকলকে জানিয়ে দিতে হবে সে ভ্রষ্টা। কিন্তু কিছুতেই তার সন্তানকে বিসর্জন দেবে না জিপসী। পিতৃ পরিচয়হীন শিশুও তাদের সংসারে অতিশয় আদরের সন্তান। জিপসী সভ্যতার হাটে ভদ্রজনের কলঙ্কমোচনের জন্য নানা ওষুধ ফিরি করে বটে, কিন্তু সে সব দাওয়াই আপন ঘরে অচল। সেখানে যে কোনও শিশু পবিত্র, অপাপবিদ্ধ; তাকে কোলে টেনে নিতে জিপসীর কোনও আপত্তি নেই।

জিপসীরা সুযোগ পেলেই গৃহস্থের ছেলেময়ে চুরি করে, এটা অপবাদ মাত্র। জিপসীর আস্তানায় শিশুর মেলা। সবই নিজেদেরই সন্তান। ঘরে যাদের এত ছেলেপুলে তারা অন্যের ছেলে চুরি করতে যাবে কোন দুঃখে। অতএব দর্শকদের সিদ্ধান্ত : অন্য ভবঘুরেরা কী করে আমরা জানি না, জিপসীদের এ দায় থেকে মুক্তি দেওয়াই ভালো। জিপসীরা ছেলেমেয়েকে যেভাবে আদর যত্ন করে, তা দেখবার মতো। প্রাচীনেরা তাদের কাছে নিজেদের সম্পর্কে নানা গল্প বলে। গল্প, উপকথা, ধাঁধা। দত্যিদানোর গল্প, 'বেং' বা শয়তানের গল্প! আর সেই জোলা এবং ফুটির গল্প। ওরা অবশ্য জোলা বলে না। ওদের গল্পে সে এক নির্বোধ জিপসী। নাম তার জ্যাক। আমাদের জোলার মতোই শহরে গিয়ে সে ঘোড়ার ডিম ভেবে বাঁধাকপি কিনে নিয়ে এসেছিল। কিংবা, গাছের ডালে বসে যে সে ডালটিরই গোড়া কাটে সেই আহাম্মকের গল্প! ছোটদের খুশি রাখার জন্য, তাদের জিপসীর মতো জিপসী করে গড়ে তোলার জন্য যত্নের অভাব নেই। যে বাপ ছেলেমেয়ের কথা ভুলে স্ত্রী নিয়ে মেতে থাকে, তাকে নিয়ে রসিকতা।

জিপসীর অন্তঃপুরে একটি খুব চালু ধাঁধা— কে নিজের সন্তানের চেয়ে অন্যের সন্তানকে বেশি ভালোবাসে? হাসতে হাসতে মা নিজেই ছোট্ট খোকাকে জানিয়ে দেয় উত্তরটা—তোর বাপ!

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে জিপসী কোনও ফাঁকি সহ্য করতে রাজি নয়। একে অন্যের প্রতি জীবনভর অনুরক্ত এবং অনুগত থাকবে, এটা ধরে নেওয়াই নিয়ম। যদি তার ব্যতিক্রম ঘটে, জিপসী পুরুষ যদি অন্য কোনও নারীর প্রতি কোনও দুর্বলতা প্রকাশ করে, কিংবা স্ত্রীকে যদৃচ্ছভাবে ব্যবহার করতে চায়, তবে স্ত্রী অনায়াসে তাকে পরিত্যাগ করতে পারে। অন্যদিকে স্ত্রী যদি বিশ্বাসের মর্যাদা না রাখে, যদি সে ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে গোপনে ভালোবাসা লেনদেন করে, তবে তার জন্য প্রাপ্য কঠোর সাজা। তার দাঁত ভেঙে দেওয়া হতে পারে, নাক কিংবা কান কেটে দেওয়া যেতে পারে, অথবা অন্য কোনও শাস্তি ধার্য হতে পারে। একটি দণ্ড—মাথা মুড়িয়ে দেওয়া। জিপসী মেয়ের কাছে সেটা প্রায় মৃত্যুদণ্ডের শামিল। যে মেয়ের মাথায় চুল নেই, তার জীবনই তো বৃথা। ফলে কোনও কোনও মেয়ে ছুটে যায় পুলিশের কাছে। গিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে—আমি চুরি করেছি, অমাকে সাজা দাও। আমাকে জেলে দাও। পরে জানা যায়, মেয়েটি আসলে সমাজের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর ঘৃণা থেকে পালাতে চেয়েছিল। দেওয়ালের আড়ালে আত্মগোপন করে মাথায় আবার চুল ফিরিয়ে আনাই ছিল তার বাসনা!

অপরাধ যাই হোক, বিচারের দায়িত্ব নিজেদের। জিপসী কখনও নিজে থেকে সভ্যতার আইন-আদালতের শরণাপন্ন হয় না। নিতান্তই যদি কেউ সে-জালে জড়িয়ে পড়ে, তবে সবাই একজোট হয়ে চেষ্টা করবে যেন-তেন-প্রকারেণ তাকে ছাড়িয়ে আনার জন্য। দরকার হয়, তারা অনর্গল মিথ্যে বলে যাবে। দরকার হয়, হাতে-পায়ে ধরবে। চাঁদা তুলে ঘুষের টাকা জোগাড় করবে, আইনজীবী নিয়োগ করবে। কিন্তু যতক্ষণ না ব্যাপারটার ফয়সালা হচ্ছে, ততক্ষণ কিছুতেই শান্ত হবে না।

জিপসীর বিচারক তার সমাজ। সে সমাজের শীর্ষে যে, সে দলপতি, 'রাজা' নয়। ওরা কখনও কখনও 'রাজা' সাজে সত্য, কিন্তু যে বুঝি নিছক আমোদের জন্য। মাইকেল লিট্‌ল ইজিপ্টের ডিউক সেজেছিল। পরবর্তীকালে অন্যরা সেখানেই থেমে থাকেনি, রীতিমতো ঘটা করে অভিষেক অনুষ্ঠানের পর নিজেকে ঘোষণা করেছে—'রাজা' অথবা 'রানি'। জার্মানির জিপসীরা অষ্টাদশ শতকের আমেরিকার মাটিতে পা দিয়ে ঘোষণা করেছিল, আমাদের দু'জন 'রাজা' রয়েছে। উনিশ শতকে সেখানে গিয়ে অবতীর্ণ হয় আর এক রাজা। ১৮৮৮ সনে রানি দ্বিতীয় ম্যাটিলডা নামে এক জিপসী মেয়ের অভিষেকও হয়েছিল আমেরিকায়। সে নাকি ঘোষণা করেছিল, আমি এদেশের তামাম জিপসীদের অধিশ্বরী। ১৯৩০ সনে পোল্যান্ডে জনৈক মাইকেল ঘোষণা করেছিল, আমি গোটা ইউরোপের রাজা—'কিং'। কিং মাইকেলের অভিষেক উৎসবে সেদিন অনেক গণ্যমান্য দর্শক হাজির। তাঁদের মধ্যে এমনকি পোলিশ রিপাবলিকের প্রেসিডেন্টও ছিলেন। ওয়ারশ পুলিশ জানিয়েছিল—মনোনয়ন এবং নির্বাচন যথাযথ ভাবেই হয়েছে। পরের বছর আবার এক অনুষ্ঠান। আর এক জিপসী গম্ভীর ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে জানাল, আগেকার নির্বাচন বাতিল, ইউরোপের জিপসীদের রাজা আসলে আমি!

১৯৫৯ সনে এক স্বর্ণকেশী জিপসী রমণী রটিয়ে দেয়, সে নাকি 'জিপসীদের রানি'—'কুইন অব দি জিপসী'। মেয়েটির নাম ছিল জারা। সে সবাইকে খুব করে খাইয়ে দেয়। বাচ্চাদের মধ্যে কিছু পয়সাও নাকি বিলি করে। সুতরাং,

সবাই মিলে জয়ধ্বনি দিল তার নামে। ব্যস, রানিগিরির ঝকমারি সেদিনই চুকে গেল। তার আগের বছর খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল আর এক রানির মৃত্যুসংবাদ। উত্তর ইতালিতে মিমি রসেত্তো নামে সেই জিপসী রানির মৃত্যুশয্যার পাশে হাজির ছিলেন বিশ্বের সাংবাদিকরা। কিন্তু সাচ্চা জিপসী এসব খবর শুনে মনে মনে হাসে। সে জানে ,এসব ঝুটা। জিপসীদের রাজ্য নেই। সুতরাং, রাজা কিংবা রানিও নেই। এই বুড়ি জিপসী আসলে'ফুরি দাই', বৃদ্ধা কোনও ঠাকুমা। আর 'রাজা'রা সব আসলে 'ভাতফ্' বা দলপতি।

জিপসী পরিবারে প্রাধান অবশ্য বাবা। এক সময় হয়তো ওদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিক ছিল। তার রেশ এখনও কোনও কোনও গোষ্ঠীতে চলেছে। সেখানে মায়ের বংশ পরিচয়ই বহন করে সন্তানেরা, ছেলেরা বিয়ে করে শ্বশুরের পরিবারে যোগ দেয়। কিন্তু সাধারণ ভাবে এখন পিতৃ-প্রভুত্বরই চল। তবে মায়ের জন্যও নির্দিষ্ট সম্মানের আসন। বিশেষত, 'ফুরি দাই' বা বৃদ্ধাদের জন্য। পরিবার অবশ্য শুধু স্বামী-স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে নিয়ে নয়। জিপসী পরিবার যথার্থই যৌথ-পরিবার। কাকা, জ্যাঠা, মাসি, পিসি—সবাইকে নিয়ে। সম্পত্তিতে পরিবারের সকলের সমান অধিকার। সমর্থ পিতার দায়িত্ব পরিবারে শৃঙ্খলা রাখা। বৃদ্ধা মেয়েরা নানা ভাবে পরামর্শ দিয়ে তাকে সাহায্য করে। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, স্বামী এবং শ্বশুর-শাশুড়ির যত্ন নেয়।

এক এক জিপসী গোষ্ঠী একাধিক পরিবারকে নিয়ে। তাদের সংখ্যা দশ হতে পারে, আবার একশোও হতে পারে। দলপতির দায়িত্বাধীন তারা সকলেই। সে মনোনীত হয় সারা জীবনের জন্য। মারা গেলে তার ছেলে দলপতি হবে এমন কোনও কথা নেই। পদটি বংশানুক্রমিক নয়। সাধারণত সে একজন বিজ্ঞ বয়স্ক ব্যক্তি। তার পোশাক পরিচ্ছদও একটু অন্যরকম। মাথায় উসকো খুসকো চুল, গায়ে ঢিলে কোট। কোটে ধাতুর বোতাম পরার অধিকার নাকি একমাত্র তারই আছে। কিন্তু সে বোতাম প্রায়ই লাগানো হয় না, জামার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় সর্দারের খোলা বুক। কাঁধে তার একটি ঝুলি কোমরে টাকার থলি। সে সবসময় সঙ্গে অনেক টাকা রাখে। কেননা, দল হঠাৎ কখন কী বিপদে পড়ে যাবে কে জানে! ওরা বলে, সোনায় জং ধরে না। অনেক সময় অন্যরাও তার কাছে নিজেদের টাকাকড়ি জমা রাখে, প্রয়োজন মতো চেয়ে নেয়। কেননা, জিপসীর ধারণা—টাকা আর শয়তান দুই চুপচাপ থাকতে পারে না।

দল এর পর কোন দিকে যাত্রা করবে, কোথায় তাঁবু ফেলবে, অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে সেই সব ঠিক করে। দলপতিকে অন্যরা পরামর্শ দিতে পারে, কিন্তু

তার সিদ্ধান্ত কেউ অমান্য করতে পারে না। দলের সেই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সে ক্ষমতার প্রতীক হাতের ওই ন্যায়দণ্ড। সেটি একটি রুপো বাঁধানো লাঠি। ওরা বলে—বারেসতি রোঙলি রুপাই—দলপতির রুপোর লাঠি। সে লাঠির মাথায় লাল ঝুটি বাঁধা, রুপোর গায়ে নানা আঁকিবুঁকি। চাঁদ, সূর্য, ত্রিশূল ইত্যাদি। তাই হাতে নিয়ে সে চলে। তাই হাতে নিয়ে সে বসে বিচার করতে।

জিপসী বিচার সভাকে বলে ক্রিস (kriss)। প্রভূত ক্ষমতা তার। অনেকটা আমাদের প্রাচীন পঞ্চায়েতের মতো। 'ক্রিস' বা বিচার সভা অনেক কিছু উপলক্ষেই বসতে পারে। যথা, দলের কোনও মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ কিংবা মারামারি, কারও প্রতি অন্যায় দুর্ব্যবহার, কিংবা জিপসী কানুনের অসম্মান। জিপসীদের লিখিত কোনও পেনালকোড নেই। কারণ ওরা লেখাপড়ার ধার ধারে না। তাই বলে ওদের অশিক্ষিত বা সংস্কৃতিহীন বলে মনে করার কোনও হেতু নেই। ঐতিহ্য, সংস্কার আর সামাজিক আচারের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে তাদের 'আইন'। মুখে মুখে সে আইন বেঁচে আছে পুরুষ থেকে পুরুষানুক্রমে তা অমান্য করার কথা কোনও জিপসী ভাবতে পারে না।

'ক্রিস'-এ ডাক পড়ে পরিবারের প্রধানদের। তা ছাড়া আসামি এবং ফরিয়াদির উপস্থিতিও আবশ্যিক। মেয়েরাও হাজির থাকতে পারে সভায়, কিন্তু কমবয়সি ছেলেমেয়েদের মতো তাদেরও কথা বলার কোনও অধিকার নেই। কথা বলতে পারে শুধু আসামি, ফরিয়াদি আর দুই পক্ষের সাক্ষীরা। 'ক্রিস' এর সভাপতি তাদের মাঝখানে বিচারকের আসনে বসে মনোযোগ দিয়ে সব শুনবে। বিচারকের আসন মানে হয়তো উপুড় করা একটা কড়াই। তাতে কিছু আসে যায় না। সভার গাম্ভীর্য বা গুরুত্ব তাতে বিন্দুমাত্র কমে না। সব শুনে সে যে রায় দেবে তাই চূড়ান্ত। অবশ্য, তার আগে দরকার বোধ করলে সে উপস্থিত প্রবীণদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারে। দুচার কথা জিজ্ঞাসা করতে পারে ফুরি দাইকেও। তারপর সহজ স্বভাবিক গলায় সে জানিয়ে দেবে নিজের রায়। এ রায়ের বিরুদ্ধে কোনও আপিল নেই।

আগে আগে নাকি 'ক্রিস' অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিত। আজকাল জিপসীরা আর তত কঠোর হয় না। যুগ পালটেছে। হ্যাঁ, ওদের তাঁবুতেও। সুতরাং, মৃত্যুদণ্ডের বদলে কান বা নাক কেটে নেওয়া, মাথা মুড়িয়ে দেওয়া—এসবেরই বেশি রেওয়াজ আজকাল। অনেক সময় বিচারপতি প্রতিদ্বন্দ্বী দু'জনের হাতে দুটি ছোরা কিংবা চাবুক তুলে দিয়ে নিজেদের মধ্যে ফয়সালা করে নিতে হুকুম দেয়। তবে সবচেয়ে কঠোর সাজা—দল থেকে বের করে দেওয়া। অর্থাৎ

চিরতরে নির্বাসন। জিপসীর কাছে সেটাই নাকি নিষ্ঠুরতম দণ্ড।

বিচার সভার ইঙ্গিতে উপস্থিত মেয়েদের মধ্যে কেউ নিজের পোশাক থেকে এক টুকরো কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় অপরাধী গায়ে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল নির্বাসিতের জীবন। দলের কেউ আর তার সঙ্গে কথা বলবে না। তার মা, বউ, ছেলেমেয়ে কেউ না। কেউ আর তার সঙ্গে পঙ্‌ক্তি ভোজে বসবে না, সে যদি ভুলেও কোনও জিনিস হাত দিয়ে ফেলে, তবে সঙ্গে সঙ্গে ওরা তা বাতিল করে দেবে, হয়তো বা পুড়িয়ে ফেলবে। গতকাল পর্যন্ত যে ছিল দলের একজন সাচ্চা জিপসী আজ সেই যেন কোনও ভয়াবহ ছোঁয়াচে রোগের রোগী তার ছায়া মাড়ানোও বিপজ্জনক। অন্য জিপসীরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে ভুলতে পারলে নিশ্চিন্ত।

কখনও কখনও নাকি আদেশ পুনর্বিবেচনা করা হয়। অপরাধী অব্যাহতি পেলে তখন আয়োজিত হবে ভোজসভা। সবাই ভরপেট খাবে। নাচে গানে অস্বস্তিকর স্মৃতিকে মুছে ফেলে আবার গ্রহণ করবে তাকে।

এসব বিধানের সঙ্গে ভারতের পঞ্চায়েতি বিচারের কিছু কিছু মিল আছে বইকি!

কিছু কিছু মিল আছে আরও একটি বিষয়ে। জিপসী যেমন ভূমিষ্ঠ হয় তার সাময়িক আস্তানার বাইরে, উঠোনের কোণে, মৃত্যুকালেও সে তেমনই বেরিয়ে আসে খোলা আকাশের নীচে। পরিবারের লোকেরা যখন বুঝতে পারে যে, সময় আসন্ন, তখন তাকে নিয়ে আসা হয় তাঁবুর বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুতে কান্নার রোল উঠে। আত্মীয়-পরিজনেরা গলা ছেড়ে কাঁদে। বিলাপ এক ধরনের গানে পরিণত হয়। তারই মধ্যে চলে শেষকৃত্যের প্রস্তুতি। সাজিয়ে গুছিয়ে মৃতদেহ স্থাপন করা হয় কফিনে। ইংল্যান্ডে জিপসীরা কফিনে মৃতের গহনা পত্র এবং পথ খরচ বাবদ কিছু নগদ অর্থও দিয়ে দেয়। স্পেনে তার গিটার বা ম্যান্ডোলিনটিও হাতের কাছে রেখে দেওয়া হয়। অনেক সময় সহমরণে যায় প্রিয় ঘোড়াটিও। ইউরোপের জিপসীরা বাহ্যত প্রায় সবাই খ্রিস্টান। সুতরাং ওদের মধ্যে কবর দেওয়াটাই প্রথা। অবশ্য সেখানেও তারা এমন কিছু কিছু কাণ্ড করে যা খ্রিস্টানি আচার নয়। কবরে ওরা জল ছিটিয়ে দেয়। হাতের কাছে জল না পাওয়া গেলে বিয়ার ঢালে। অনেক সময় শেষকৃত্যর সময় বাদ্যভাণ্ডও বাজে। শ্মশান থেকে ফিরে ওরা পেছনে না তাকিয়ে আস্তানায় ফিরে এসে, যে চলে গেল তার কাপড়জামা জিনিসপত্র সব ফেলে দেয়, কিংবা পুড়িয়ে ফেলে। তার তাঁবু কিংবা গাড়িটিও জ্বালিয়ে দেওয়া কিংবা বেচে দেওয়াই বিধান। নিতান্ত

ব্যবহার করতে হলে আগাগোড়া রং করে নিতে হবে আবার যেন নতুন। শোক তথা অশৌচ চলে বেশ কিছু দিন ধরে। সে সময়ে চুলে তেল দেওয়া বা চুল আঁচড়ানো বারণ। বারণ স্নান করা। ওয়েলস্-এ শ্রাদ্ধশান্তির ব্যবস্থাও আছে। গরিবদের ধরে এনে নগদ দক্ষিণা দিয়ে খাইয়ে দেওয়া হয়। পরিবর্তে তারা মৃতের যাবতীয় পাপের দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে তুলে নেয়।

এক সময় জিপসীরা নাকি মৃতদেহ ভাসিয়ে দিত নদীতে। এখন কবর দেওঁয়াটাই নিয়ম। কে কোথায় চিরকালের মতো ঘুমিয়ে রইল জিপসী আর তা নিয়ে ভাবে না। ওরা নিঃশব্দে আবার পথ ধরে। কবরের উপর নিজে নিজে বুনো ফুল ফোটে ঝরে পড়ে। জিপসী সেদিকে আর তাকাতে চায় না।

জিপসীরা কি ধর্মেও ভারতীয়? এক কথায় চট করে তার উত্তর দেওয়া শক্ত। একদা নিশ্চয়ই তার সুস্পষ্ট ধর্ম ছিল। নানা বিপরীত হাওয়ায় আধ্যাত্মিকতার সে পতাকাটি বহুকাল ছিঁড়ে গেছে, দণ্ডশীর্ষে যে বিবর্ণ টুকরোটি এখনও পতপত করে উড়ছে, তাকে শনাক্ত করা খুব সহজসাধ্য নয়। এখানে হঠাৎ কয়েকটি স্বস্তিক চিহ্নের আবিষ্কার, ওখানে শোনা কিছু প্রবচন ও প্রবাদ, কিছু প্রার্থনা মন্ত্রের অবশেষ, কয়েকটি বিশেষ আচার—এছাড়া হিন্দু ধর্মের বিশেষ কোনও স্মারক নাকি আজ আর ওদের তহবিলে নেই। তবু বিশেষজ্ঞদের দৃঢ় বিশ্বাস, জিপসী একদিন হিন্দুই ছিল।

জিপসী একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। তার ঈশ্বর—'ও দেল' বা 'ও দেবেল'। তিনিই অগ্নি, বায়ু, বৃষ্টি। তিনিই মহাকাল। তবে জিপসী ঈশ্বরকে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার করে না। ওরা মনে করে, মহাবিশ্ব অনন্তকাল ধরে নিজে নিজেই রয়েছে। ঈশ্বরের আবির্ভাবের আগে থেকেই রয়েছে 'ফু' বা ধরিত্রী। এই ধরিত্রীতে একদিন অবতীর্ণ হলেন ঈশ্বর—'ও দেবেল'। কিন্তু তিনি একা নন, প্রায় একই সঙ্গে এল 'ও বেং'—শয়তান। এক শুভ, অন্য অশুভ। মানুষের সৃষ্টিকর্তা তারাই। শয়তান মাটিতে দুটি পুতুল গড়ল, ঈশ্বর দিলেন তাদের মুখে ভাষা। ওরাই আদি মানব মানবী।

নিষিদ্ধ ফল ইত্যাদির কাহিনিও ঠাঁই পেয়েছে জিপসী পুরাণে। তবে সব সম্প্রদায় এক ধরনের সৃষ্টি-কথা বলে না। কেউ কেউ মনে করে, চন্দ্র সূর্যও ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। তবে আগে তিনি মানুষ গড়েছেন, তারপর এসব। সে যা হোক, জিপসীরা চাঁদ এবং সূর্যের বিশেষ মহিমা স্বীকার করে। বিশেষত, চাঁদের। তাদের নানা আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত চাঁদ। প্রতিবার নতুন চাঁদের দিকে তাকিয়ে জিপসী প্রার্থনামন্ত্র আওড়ায় : প্রকাশিত হল নতুন চাঁদ। সে আমাদের সৌভাগ্যের

সূচনা করুক। সে জানে আমরা কপর্দকহীন সে আমাদের সম্পদ দিয়ে যাবে, স্বাস্থ্য দেবে, অর্থ দেবে। জিপসীর কাছে তারারও নানা মাহাত্ম্য। ভিক্ষু চমনলাল লিখেছেন—ওরা হিন্দুর মতো মানত করে, উপোস করে। ওরা হিন্দুর মতো কর্মফল এবং পরজন্মে বিশ্বাসী, কিন্তু স্বর্গ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।

খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পরও জিপসীরা এক বিচিত্র ধর্ম সম্প্রদায়। তারা মূর্তিপুজো করে। তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি খ্রিস্টানদের থেকে স্বতন্ত্র।

সার্বিয়ার কোসোভো প্রদেশে গ্রাকানিকার (Gracanica) প্রাচীন মঠ। চতুর্দশ শতকে সার্বিয়ার এক রাজা সেটি স্থাপন করেছিলেন। আগস্টের একটি বিশেষ দিনে বলকান এলাকার জিপসীরা সমবেত হয় সেখানে। ১৯৪৫ সনে মঠটি নাকি কার্যত তাদের অধিকারেই চলে এসেছে। অনুষ্ঠানের দিন দূর দূর জায়গা থেকে জিপসীরা ছুটে আসে সেখানে। বন্ধ্যা মেয়ের ধারণা এখানে পুজো দিলে সন্তান আসবে কোলে, গর্ভিনীর বিশ্বাস—প্রসব নির্বিঘ্ন হবে। রোগীরা আসে নিরাময়ের আশায়, সুস্থ সবলেরা আসে স্বাস্থ্য অটুট রাখার বাসনায়। একটা বিবরণে দেখছিলাম, ওরা সেখানে মুরগি মানত করে, ডালিতে সাজিয়ে নববস্ত্র অর্ঘ্য দেয়, নগদ প্রণামিও দেয় অনেকে। একসময় ভার্জিন মারির নামে উৎসর্গীকৃত এই মঠে ভেড়াও বলি দিত ওরা। সে প্রথা উঠে গেছে, কিন্তু মেয়েরা এখনও সেখানে গিয়ে দন্ডি কাটে!

তবে ইউরোপীয় জিপসীর প্রিয়তম আরাধ্য 'সারা'। 'সারা লা কালী' (sara-la kali)। তাদের সারা আর খ্রিস্টীয় সারা এক নন।

প্রতি বছর ২৪ ও ২৫ মে দক্ষিণ ফ্রান্সের সেইন্টস্ মারিস ডে লা মের-এ (Saintes Maries-de-la-Mer) জিপসীদের জাতীয় উৎসব ও মেলা। ইউরোপের নানা দেশের নানা সম্প্রদায়ের জিপসীরা তখন সেখানে এসে মিলিত হয়। আসে আমেরিকার জিপসীরাও। উপলক্ষ—সারা লা কালীর আরাধনা।

খ্রিস্টীয় উপকথায় আছে, মারি সালোম, মারি জ্যাকোল আর মারি ম্যাগডেলেনের সঙ্গে তাঁদের পরিচারিকা সারা এসে নেমেছিলেন এই গ্রামে। সেই উপলক্ষে স্থানটি ছিল ক্যাথলিকদের তীর্থক্ষেত্র। জিপসীরা বলে, তাদের সারা এক জিপসীকন্যা। তিনি রোমের তীরে নিজের দল নিয়ে বাস করছিলেন। তিনি যখন শুনলেন খ্রিস্টীয় মৃত্যুসময়ে যে পুণ্যাত্মা মারিরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা এখানে অবতরণ করেছেন, তখন তিনি ছুটে সমুদ্রের ধারে গিয়ে হাজির হলেন। ওঁরা তখনও তীরে এসে পৌঁছাননি। সারা দেখলেন সমুদ্রে প্রবল ঢেউ। ওঁদের নৌকো টলটলায়মান। তিনি তখন নিজের পোশাক খুলে ছুঁড়ে দিলেন ওঁদের

দিকে। তাঁর সাহায্যেই ওঁরা নিরাপদে ডাঙায় এসে পৌঁছেছিলেন। এসব কারণেই সারা তাদের আরাধ্য।

সেখানে কৃষ্ণা সারার একটি মূর্তি রয়েছে। কালো রং তাঁর। এক সময় নাকি মূতিটি ছিল কাঠের। এখন প্লাস্টারে গড়া। তবে এ মূর্তিরও বয়স হয়েছে। জিপসীরা দুদিন ধরে তার ভজনা করে। তার জন্য কোনও পাদ্রী বা পুরোহিতের দরকার হয় না। ওরা খালি পায়ে, টুপি খুলে ভেতরে ঢোকে। মেয়েরা সারার গায়ে জমাকাপড় ঝুলিয়ে দেয়। তাঁর হাতে এবং পোশাকে চুমো খায়। গায়ে শ্রদ্ধা সহকারে হাত বুলায়। সারার মূর্ত্তিকে স্পর্শ করাটাই বলা চলে প্রধান অনুষ্ঠান। পরিবারের যারা আসতে পারল না, অনেকে তাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্রও ছুঁইয়ে নিয়ে যায়। রাতে ওরা সারার ঘরে জেগে থেকে নিশি পালন করে। যে যেখানে পারে ধরনা দিয়ে পড়ে থাকে। দৃশ্যটি দেখে একজন ফরাসি দর্শকের মন্তব্য— যেন কোনও ভারতীয় দেবীমন্দিরে আছি। মন্দিরের অনুষ্ঠান শেষে তারা প্রতিমাটিকে বয়ে নিয়ে যায় সমুদ্রে। প্রতিমা সহ জলে নেমে বিসর্জনের অভিনয় করে। তারপর আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে গির্জার ভেতরে।

সারা লা কালীর আরাধনা নাকি অন্যত্রও হচ্ছে আজকাল। ১৯৭১ সনের এপ্রিলে লন্ডনে বিশ্ব রোমানি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন নানা দেশের জিপসী বিশেষজ্ঞ, গায়ক ও নর্তকীরা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন একজন ভারতীয় বিশেষজ্ঞ। তিনি লিখছেন : যুগোশ্লাভিয়ার পার্লামেন্টের জিপসী সদস্য আবদি ফাইক আমাকে বললেন—আমরা পাঞ্জাবের লোক। আমরা জানি, আমাদের ভাষাও মূলত পাঞ্জাবের। মস্কোর জিপসী থিয়েটারের সুখ্যাত গায়িকা রায়া বললেন—আমার হৃদয় ভারতীয়। উৎসব শুরু হল রোমানি পতাকা উড়িয়ে। পতাকার রং নীল আর সবুজ। মাঝখানে একটি লাল চক্র। দেখে আমাদের জাতীয় পতাকার অশোক চক্রের কথা মনে পড়ে যায়। তবে বিস্ময় চরমে পৌঁছাল, সব অনুষ্ঠান শেষে ওরা যখন সেন্ট সারার মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা করে বের হল। সম্ভবত ইনি আমাদের কালীমাতারই খ্রিস্টানী রূপান্তর। ওরা প্রতিমাটিকে কাছেই এক পুকুরে বিসর্জন দিয়ে দিল—ঠিক ভারতে যা করা হয়।

শ্রীঋষি লিখছেন: হাজার বছর আগে এই জিপসীদের পূর্বপুরুষেরা যখন ভারত ছাড়ে, তখন তারা কালীর পুজো করত। কালে কালে তারা নিজেদের সেই কালী মায়ের কথা ভুলে গেছে। খ্রিস্টীয় ধর্মের প্রভাবে এখন ওরা তাঁর নাম দিয়েছে সেন্ট সারা। চার্চ এখনও এই সারাকে সন্ন্যাসিনী হিসাবে মেনে নেয়নি।

তাতে কিছু আসে যায় না। জিপসীদের তাঁবুতে এবং ধ্যানেও নাকি রয়েছেন

এই কালো সারা, তথা মা কালী। ফরাসি দেশের এক জিপসী মহিলা এই প্রতিমা গড়ায় রীতিমতো নাম করেছেন। অন্য জিপসীরা তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করে সে প্রতিমা ঘরে প্রতিষ্ঠা করছে!

আসল কথা শূন্যতায় মন ভরে না। চরম অদৃষ্টবাদী জিপসীও তাই জীবনের শূন্যস্থানগুলো ভরিয়ে তুলতে চায়। রূপে, রঙে, রসে জীবনের সে সম্পূর্ণ স্বাদ চায়। শান্তি চায়। দেহ এবং মনের শান্তি দুইই। তাই এই সারাকে খুঁজে নেওয়া, নানা অসংলগ্ন পথে তৃপ্তির সাধনা। অন্যের কাছে এসব ধাঁধা বটে, কিন্তু জিপসীর কাছে নয়। যাজক যখন এসে তার কাছে ঈশ্বরের অপার মহিমার কথা বলে, জিপসী তখন আঙুল তুলে অদূরে দণ্ডায়মান পুলিশটিকে দেখায়। ইংরেজিতে ওদের একটি গানের কলি:

আই হ্যাড এ ফেলো প্রিচিং টু মি,—
অল দিস ল্যান্ড অব লিবার্টি;
বাট আই টেল্ হিম—মাই লিবার্টি ইজ পিস!

জিপসীর কথা—নিজের জন্য মাটি চাই না, ছকবাঁধা ধর্ম চাই না, নিশ্চিত রুটির প্রতিশ্রুতি চাই না। একমাত্র কামনা আমার শান্তি।

চাইলেই শান্তি মেলে না।

আত্মরক্ষার জন্য সব চেষ্টাই করেছে জিপসী। নানা কৌশল অবলম্বন করেছে। অন্যরা যাতে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, সেজন্য সে গরিব সেজেছে। ভিখারির নিখুঁত পোশাক তার অঙ্গে। তার জন্য কোনও খেদ ছিল না জিপসীর। তবু সে হাসত। কেননা, জিপসীর জীবনদর্শন বলে—সব চেয়ে বড় পাপ, না হাসতে পারা। এক টুকরো রুটির জন্য সারাদিন পথে পথে ঘুরেছে যে মানুষ, দিনের শেষে গরম চায়ের প্রথম পেয়ালাটা হাতে পাওয়া মাত্র তাই সে সম্রাটের মতো হাসত। ক'টি তাম্রমুদ্রার জন্য যে তরুণী নেচে নেচে হয়রান হয়ে তাঁবুতে ফিরে আসে, সেও পরক্ষণেই তুচ্ছ কৌতুকে হেসে লুটোপুটি খায়। তবু দারিদ্র যে ওদের আজন্ম কুলচিহ্ন, সে নাকি শুধু অন্যদের দূরে রাখার জন্য। ওই নোংরা ছেঁড়া পোশাক, দু'টি পয়সার জন্য এই আকুতি মিনতি, এসব আসলে সযত্নে রচিত কাঁটাতারের বেড়া। জিপসী বলতে চেয়েছিল—তফাত থাক। বলতে চেয়েছিল—আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও।

চলতে চলতে শামুক যেভাবে হঠাৎ নিজেকে খোলসের মধ্যে গুটিয়ে নেয়, ঠিক সেভাবেই নিজেদের চারপাশে রহস্যের একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তুলেছিল ওরা। একই সঙ্গে গড়ে তুলেছিল ভয়ের পরিমণ্ডল। আপন চলনভঙ্গিতে সে ইচ্ছে করেই যেন চারদিকে রটিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল—তার রীতিনীতির বালাই নেই, ধর্মাধর্ম জ্ঞান নেই, সমাজ নেই। সে কথা বলে—সাংকেতিক ভাষায়। সে চোর, জুয়াচোর, প্রতারক। নিজের সম্পর্কে এইসব ভুল ধারণাকে প্রশ্রয় দেওয়ার পেছনেও বক্তব্য ছিল একটাই : আমাকে বেশি ঘাঁটিও না। কিন্তু অন্যরা তা শুনবে কেন?—

'কিল দেম, কিল দেম অল!' ক্রায়েড ওয়ান,
দেন্ অ্যানাদার—'লেট দেম ডাই!'
দেন আই হার্ড এ থার্ড সে—'হোয়াই?
হোয়াট হ্যাভ দি পুওর জিপসীজ ডান?'
আই ক্রাই টু গড অ্যান্ড সে—

অ্যালাস! হাউ ফিউ উই আর!
উই পুওর কালো!

—একজন চেঁচিয়ে ওঠে—মেরে ফেল, ওদের সব ক'টাকে মেরে ফেল।—হ্যাঁ, ওদের মরাই ভালো, বলে আর একজন। তৃতীয় একজনের মুখে অবশ্য অন্য কথা। সে বলল—কেন, বেচারা জিপসীরা কী করেছে? আমি ঈশ্বরকে কেঁদে বলি—হায়, সংখ্যায় আমরা কত কম—আমরা গরিব কালোরা?—জিপসীর এই গানটিতে বেদনার যে সুর, এক-আধজনকে স্পর্শ করে হয়তো, কিন্তু তিনিই কি জানেন যে, চুরি কাকে বলে জিপসীর কাছে তা এখনও যথেষ্ট স্পষ্ট নয়।

অন্তহীন পথে ক্ষুধার্ত যাত্রীদল পথের দু'ধারে যা পেয়েছে, প্রয়োজন মতো তা-ই সে হাতে তুলে নিয়েছে। ফলমূল, সজারু, খরগোশ, বুনো-মুরগি। পথের ধারে হঠাৎ হাতে পাওয়া মুরগিটি বনের না দু'ক্রোশ দূরের কোনও চাষির, তা নিয়ে ভাবার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করত না ওরা। ওদের কাছে সবই প্রকৃতির দান,—ঈশ্বরের সৃষ্টি। ওরা মনে করত, আলো-হাওয়া-জলের মতোই কুড়িয়ে পাওয়া বা জোগাড় করে নেওয়া খাদ্যেও সকলের সমান অধিকার। এখানে কোনটা কার, সে প্রশ্ন ওঠে না। সভ্যতা যে ব্যক্তিগত সম্পদ-ভিত্তিক, সে সংবাদ তখনও ওদের অগোচরে। সেটা একদিন তাকে জানিয়ে দেয়া হল বটে, কিন্তু জিপসী তখন সংশোধনের অতীত। মুরগিটা নিয়ে সে বুক ফুলিয়ে দিনের আলোয় আর তাঁবুতে ফেরে না, এই যা। তখনকার মতো মাটি চাপা দিয়ে রেখে দেয়। হয়তো দিন দুই পরে সুযোগ বুঝে নিয়ে আসে। ঈষৎ পচা মাংস-নাকি জিপসীর প্রিয়। অনেকের ধারণা সে শুধু এ-কারণেই। সভ্যতার খাস-এলাকায় সে আর তাজা মাংস সংগ্রহ করতে পারে না।

চুরি বলা নিষ্প্রয়োজন, জিপসীর চোখে 'গাজো'দের কথা। থানা, পুলিশ, জেল—এসব স্বার্থপর গৃহস্থের ভাষা। জিপসী এসব উৎপাত এড়াতে চায় বটে, কিন্তু এসব নীতিশাস্ত্রে তার কোনও আস্থা নেই। সুযোগ পেলে সে বরং 'গাজো'র আইন দেখিয়ে 'গাজো'কেই ঠকিয়ে দেবে। বার্লো নামে এক জিপসীর গল্প পড়ছিলাম। সে ব্রিটেনে থাকত। একদিন সে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এমন সময় এক মোটরগাড়িওয়ালা একটি বেড়ালকে চাপা দিয়ে দিল। লোকটি গাড়ি থামানো মাত্র বার্লো চেপে ধরল তাকে—কী অন্যায় কথা। দাঁড়াও আমি পুলিশে খরব দিচ্ছি। গাড়িওয়ালা ভড়কে গিয়ে তার হাতে একটা এক পাউন্ডের নোট গুঁজে দিয়ে বলল—দোহাই লাগে, থানায় না গিয়ে বরং পাব-এ চলে যাও। বার্লো বলল—আচ্ছা দেখছি। লোকটি গাড়ি চালিয়ে সবেগে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

বার্লো বেড়ালটাকে লেজে ধরে মাঠে ছুঁড়ে দিয়ে নিজের পথ ধরল! প্রতারণা কাকে বলে জিপসী তা জানে না। এসব তার কাছে বুদ্ধির খেলা মাত্র। ওদের ভাষায় চুরিকে বলে —'চিরাভ'। কিন্তু নিজেদের তাঁবুতে তার সঠিক অর্থ 'চুরি' নয়— 'নেওয়া!'

স্বার্থপর 'গাজো' এসব তত্ত্ব বোঝে না। তাই ওদের গাঁয়ের ধারে খুঁটির মাথায় নোটিস ঝোলে—'নো নোমাডস্!'—'নো' জিপসীজ!' জিপসী ওদের নিজের কথা বোঝাতেও চায় না। সে নোটিশগুলোর দিকে তাকায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর আবার গাড়িতে গিয়ে বসে। ওদের আত্মরক্ষার আর এক কৌশল এই সচলতা। ওরা জেনে গেছে, সভ্যতার সংক্রমণ থেকে নিজেদের গোষ্ঠীকে বাঁচাতে হলে, নিজের সুখী-জীবনের আদর্শকে রক্ষা করতে হলে, পথই শ্রেষ্ঠ পথ। আঘাত করলে জিপসী কখনও প্রত্যাঘাত করে না, সে নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে যায়। এই সভ্যতার কাছে তার কোনও প্রত্যাশা নেই। সুতরাং, নালিশ কিংবা অভিমানও নেই। জীবন ওদের কাছে দিগন্তের মতো। সব সময়ই চোখের সামনে রয়েছে নতুন রেখা। এখানে যদি ওরা থামতে না দেয় না দিক, আর একটু এগিয়ে গেলেই হল।

কী ঘোরাটাই না ঘুরছে ওরা! দশ শতকের পথ। এ পথ পরিক্রমা করছে জিপসী প্রধানত পায়ে হেঁটেই। দলের সঙ্গে একটি দুটি গাধা বা ঘোড়া থাকলে, তার পিঠে মালপত্তর চাপিয়ে বছরের পর বছর হেঁটেছে ওরা। কারও কারও হয়তো গোরুর গাড়ি ছিল। নিরেট চাকাওয়ালা ভারী গাড়ি। মস্ত শিংধারী গোরু সে গাড়ি টানত। সাইথিয়ানদের যেমন ছিল, অনেকটা সে ধরনের গাড়ি। ক্রমে অবশ্য চাকার চেহারা পালটায়। পালটায় গাড়ির চেহারাও। মধ্য ইউরোপে পৌঁছানোর পর গোরুর ছুটি, এল ঘোড়া। পশ্চিম ইউরোপে জিপসীর সেই ঘোড়ায় টানা বিশাল গাড়িগুলো এখনও চোখে পড়ে। অনেকেই এখন মোটর ভ্যান ব্যবহার করছে। সুন্দর রং করা গাড়ি, জানালায় পর্দা ঝুলছে, ভেতরে স্টিয়ারিং-এর এক পাশে চলছে টেলিভিশন, আর এক কোণে চুপ করে আছে রেডিও। বিরাট বিরাট গাড়ি। একশো কিলোমিটার চলতে তেল খায় নাকি কুড়ি লিটার। কিন্তু দুটো পরিবার অনায়াসে তাতে বাস করতে পারে। জিপসী তাই নিয়ে এ গাঁ থেকে সে গাঁ, এ শহর থেকে সে শহরের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু আর কত কাল? আর ক'দিন থাকবে তার এই চলার স্বাধীনতা?

এখনও প্রতি পদক্ষেপে ফাঁকি দিয়ে চলতে হয় ওদের। পথে নানা বিধিনিষেধ। জিপসী অবশ্য তা ডিঙাবার কৌশল জানে। বাধ্য হয়েই তাকে জানতে হয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ওরা নাকি রাশিয়া থেকে পলাতকদের পাসপোর্ট সংগ্রহ করে সেগুলোকে কাজে লাগিয়েছে ইউরোপের নানা দেশে। গ্রিক সেজে ওরা অনেকে তুরস্ক থেকে ছাড়পত্র সংগ্রহ করেছে, কখনও বলেছে—আমরা রিপাবলিকান, স্পেন থেকে এইমাত্র পালিয়ে এলাম! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ওদের পক্ষে যেমন চরম দুর্দিন, অন্যদিকে তেমনই ভবঘুরে জিপসীর কাছে অতিশয় সুখের দিন। তার সামনে সেদিন ঘুরে বেড়ানোর অফুরন্ত সুযোগ।

নেদারল্যান্ডস্-এ একটা জিপসী সম্প্রদায় ছিল। তখন তারা গুয়াতেমালা সরকারের পাসপোর্ট জোগাড় করত। গুয়াতেমালা সরকার তখন পূর্ব ইউরোপের ইহুদিদের দু'হাতে পাসপোর্ট বিলি করছিলেন। জিপসীরা তাদের ভিড়ে মিশে যায়। সে সময় ব্রাজিল, নিকারাগুয়া এবং ডোমিনিক্যান রিপাবলিক সরকারও শরণার্থীদের জন্য বিশেষ ধরনের ছাড়াপত্র বিলি করছিলেন, জিপসীরা সে বদান্যতারও সুযোগ নিতে আরম্ভ করে। হঠাৎ ওদের মধ্যে সেদিন রীতিমতো ব্যস্ততা। সেটা যে শুধু আত্মরক্ষার জন্য তা নয়, পিছনে ছিল নতুন নতুন দেশে অভিযাত্রী হওয়ার অদম্য বাসনাও। স্পেন থেকে একটি পরিবার ইংল্যান্ডে গিয়ে হাজির হয়ে বলেছিল— আমরা পোলিশ শরণার্থী! অনেকে আবার যুগোশ্লাভ নাগরিক সেজে পাড়ি দেয় মিশরে। পঞ্চাশের দশকেও কয়েকটা দল সুকৌশলে চলে আসে পূর্ব-জার্মানিতে। সেখানে কিছুকাল কাটিয়ে পশ্চিম-জার্মানিতে। শেষ পর্যন্ত তারা কোথায় গিয়ে পৌঁছল কে জানে। হয়তো আবার ফিরে এসেছে পোল্যান্ডেই। আমেরিকায় বহিরাগতদের সম্পর্কে নানা কড়াকড়ি। সে জালে জিপসী ধরা পড়ে নাকি কদাচিৎ। আমেরিকা থেকে কিছু কিছু জিপসী তুরস্কে চলে এসেছিল। ফিরে এসে তাদের দাবি—দুয়ার খোল, আমরা মার্কিন নাগরিক। কথাটা অস্বীকার করা যায় না। কোমর থেকে শতচ্ছিন্ন কাগজ বের করে জিপসী, এক সময় সে এদেশেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল বটে। হাঙ্গেরির জিপসীরা সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে হবে শুনলেই, সীমান্ত পেরিয়ে অন্য দেশে চলে যায়। তারপর কিছুকাল এদিক সেদিক ঘোরে। ফিরে এসে বয়স বছর দশেক বাড়িয়ে বলে। বলে—বুড়োকে নিয়ে আর টানাটানি করো কেন?

পালাবার কৌশল ওদের অতি চমৎকার। যে দেশেই থাকুক, জিপসী দলপতিরা আপন সম্প্রদায়ের গতিবিধির খবর রাখে। ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক শহরের একটি দুটি করে পানশালা কিংবা খাবারের দোকান আছে, যেখানে ওরা নিয়মিত খদ্দের। তাছাড়া কিছু জিপসী-পাগল গাজো অনুরাগী আছে। তাদের সাহায্যে এক দেশ থেকে অন্য দেশে টেলিগ্রাম পাঠানো যায়, ফোন করা যায়, চিঠিপত্র লেখানো

যায়। চিঠিপত্র আসে—হয় সেই পানশালার ঠিকানায়, না হয় বড় ডাকঘরে। জিপসীর চিঠিতে 'কেয়ার-অব—জেনারেল ডেলিভারি' লিখে দিলেই হল, ডাকঘরের একটা বিশেষ কোণে তা রেখে দেওয়া হবে, যে যার চিঠি বেছে নিয়ে যাবে। জিপসী যদি নিজে না যায়, তবে অন্যের পক্ষে সঠিক চিঠি খুঁজে বের করাও শক্ত! যাকে এই শহরে সবাই পুলিকা বলে জানে, অন্যত্র সে হয়তো পরিচিত পেতালো নামে। কোথায়ও আবার নাম তার—কলম্বাস, কোথাও বা ভাদোস, কিংবা—পেটারলো! চিঠিকে ওরা বিশ্বাস করে কম। কেননা, চিঠির মুখ নেই, চোখ নেই, কণ্ঠস্বর নেই। তাছাড়া ওসব চিঠি সাধারণত গাজোকে দু'বোতল বিয়ার খাইয়ে লেখানো! সুতরাং, আজকাল ওরা ফোনের দিকেই নাকি ঝুঁকছে বেশি। প্রথমে একটা পোস্টকার্ড পাঠিয়ে দেয় পোস্ট অফিসের ঠিকানায়, তাতে বলে দেয়, অমুক সময় সেই 'পাব'টিতে হাজির থেকো, দরকারি কথা আছে।

ফোনেই শলাপরামর্শ হয়ে গেল। জিপসী গাড়ি-বাড়ি নিয়ে স্থানত্যাগ করল। দু'মাস পরে হয়তো দেখা যাবে, তার ক্যারাভান এসে দাঁড়িয়েছে সীমান্তের অদূরে। সেখানে ক'দিন থেকে পরিবেশ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে একদিন রাতের অন্ধকারে হয়তো গাড়ির সারটি আবার চলতে শুরু করবে। থামবে গিয়ে সীমান্তের ওপারে, অন্য দেশে, যেখানে আর একটি দল বেশ কিছুদিন ধরে অপেক্ষা করে আছে। যেখানে কুড়িটি গাড়ি বা পরিবার ছিল, সেখানে রাতারাতি তা পঁচিশটিতে পরিণত হলে চট করে সেটা ধরা শক্ত বইকি!

অনেক সময় ওরা অন্যভাবেও সীমান্ত পার হয়। যেমন হাঙ্গেরির ওরা। সীমান্তের যে অংশে জনবসতি কম, ওরা সেখানে গিয়ে আস্তানা গাড়ে। তারপর রক্ষীবাহিনীর নিঃসঙ্গ জীবনকে নাচে গানে ভরিয়ে তোলে। ধীরে ধীরে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কাজের শেষে ওরা জিপসীর তাঁবুতে আসে, গান শোনে, নাচ দেখে। আসর যখন জমজমাট, তখন যাদের অবিলম্বে দেশান্তরী করা দরকার, অর্থাৎ যাদের সৈন্যদলে যোগ দেওয়ার জন্য ডাক পড়েছে, তারা নিঃশব্দে ওপারে চলে যায়। অনেক সময় 'এই আসছি' বলে রক্ষীদের চোখের সামনেই ওরা সীমান্ত পার হয়। ফিরে আসবে হয়তো পাঁচ বছর পরে, সে দেশে তাড়া খেয়ে। অনেক দেশই জিপসীর 'উৎপাত' থেকে অব্যাহতি চায়। সুতরাং, কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করতে পারলে খুশিই হয়। তাদের উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, জিপসী মনে মনে তাদের ধন্যবাদ জানায়। কেননা, ওদের, জন্যই দেশ ভ্রমণের এই নতুন সুযোগ।

—কেন ঘুরে বেড়াও তোমরা?

এই প্রশ্নের উত্তরে গলা ছেড়ে গান জুড়বে জিপসী :

আমি কালো হয়ে জন্মেছি;
আমার বাড়ি নেই, আমি ঘুরে বেড়াই,
নিঃসঙ্গ শিশু আমি…।
ফুল কখনও ভালো জামাকাপড় পরে কি?
পাখি কি কখনও রাই ভানে?
ঈশ্বর আমার পিতা,
তিনিই দায়িত্ব নিয়েছেন আমার।

কেন তুমি ঘুরে বেড়াও?—
জানতে চায় ওরা!
আমি জানি না,
উড়ে যাচ্ছে যে পাখি
উত্তর দিক সে।
উত্তর দিক—বনের হরিণ।…

এ গান গাইতে গাইতে স্প্যানিস জিপসীর দু'চোখ দিয়ে যদি জলের ধারা নামে, তবে জেনে রাখা ভালো, সে অশ্রু বেদনার নয়, আনন্দের। 'জিপসীজ হু এভরি ইল ক্যান কিওর/অ্যাক্সেপ্ট দি ইল অব বিয়িং পুওর'—জিপসীর নয়, 'গাজো'র পদ্য। দারিদ্র নিয়ে তার যেমন কোনও খেদ নেই, তেমনই কোনও খেদ নেই ছয় ঋতু বারো মাস সে পথে পথে ঘুরে বেড়ায় বলে। দুঃখ বরং, সে স্বাধীনতাটুকুও চলে যাচ্ছে দেখে। ডোরথি নামে একটি ইংরেজ মেয়ে টনি বাটলার নামে এক জিপসী তরুণের প্রেমে পড়ে। শেষ পর্যন্ত নানা প্রতিকূলতার মধ্যে ওদের বিয়েও হয়। বিয়ের পর ডোরথি স্বামীর সঙ্গে সেই যে গাড়িতে চড়েছিল, আর নামেনি। দু'বছর পরে পথেই ভূমিষ্ঠ হয় ওদের প্রথম সন্তান। প্রথম প্রথম সব অসহ্য মনে হতো। ডোরথি লিখছেন—আমার স্বামী বলত, যারা পথিক, শেষ পর্যন্ত তারাই টিকে থাকবে এই দুনিয়ায়। দু'বছর পরে আমারও আজ তা-ই মনে হয়। মনে হয়—পথে পথে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, অনন্তকাল বেঁচে থাকবে তারাই। এ জীবনের তুলনা নেই।

জিপসীও তা-ই বোধহয় বলতে চেয়েছিল। বলতে চাইছে। অন্তত পাঁচ লক্ষ বছর ধরে মানুষ পৃথিবীর বুকে এমনি করেই ঘুরে বেড়িয়েছে। সেদিন গৃহস্থ ছিল না কেউ। তারপর ক্রমে সভ্যতা। আলো। প্রলোভন। জিপসী এই সভ্যতাকে কিছুই

দেয়নি, এমন কথা বলা যায় না। আগেই বলা হয়েছে, ইউরোপের নাচে, গানে এবং সার্কাসে তার কিছু অবদান আছে। অবদান আছে ধাতু বিদ্যায় এবং কোনও কোনও কারুশিল্পেও। স্পেনে মাখন চালু করেছিল ওরা। সেখানে মাখনকে বলে 'মানতেকা' (manteca)। ওটা রোমানি বা জিপসী শব্দ! এসব টুকিটাকি জিনিস দিয়েই সে তার দায়িত্ব শেষ বলে ধরে নিতে চেয়েছিল পরিবর্তে সভ্যতার ফাঁদে ধরা দিতে চায়নি সে। কেননা, জিপসীর চোখে সেটা আত্মহত্যার শামিল। কারণ, ওরা জানে গাজোর পৃথিবীতে অনেক সমস্যা। সেখানে মানুষ একে অন্যকে খুন করে, আগুন নিয়ে খেলে, বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে আমোদ করে, কখনও বা নিজেকে নিজেই হত্যা করে। জিপসীর তাঁবুতে আত্মহত্যার ঘটনা নাকি এখনও অজ্ঞাত।

আরও অনেক অসম্ভবই সম্ভব করেছিল ওরা। নিঃশব্দে কোনও অস্ত্র হাতে না নিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে এমন অভিযানের নজির মানুষের ইতিহাসে বোধ হয় আর দ্বিতীয়টি নেই। যেভাবে হাজার বছর ধরে সামান্য উপকরণ নিয়ে ওরা বিশ্ব পরিক্রমা করেছে, তা অবিশ্বাস্য। চেঙ্গিস খাঁ বা তৈমুরের চেয়েও ওদের কৃতিত্ব চমকপ্রদ। ছিন্নমূল ইহুদিরাও দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু জিপসীর কাছে এক জায়গায় তারা হেরে গেছে। জিপসী যেভাবে আদি ভাষা, আচার, জীবন-দর্শনকে রক্ষা করেছে বিপরীত পরিবেশে, আর কোনও জনগোষ্ঠী তা করতে পারেনি। এখনও নিজেদের রক্ত, নিজেদের ধর্ম, নিজেদের জীবনভঙ্গি সম্পর্কে সমান গর্ববোধ তাদের। অথচ এক কোটি বিশ লক্ষ মানুষ কোনও বিশেষ দেশে বাস করে না, ছড়িয়ে আছে অন্তত চল্লিশটি দেশে। জিপসী যেন প্রকৃতির কোনও খেয়াল—সুদুর্লভ এক সৃষ্টি। খুঁজলে সর্ব দেশেই হয়তো তার সন্ধান পাওয়া যাবে, কিন্তু কোনও বিশেষ ঠিকানায় নয়, বিশেষ পল্লিতে নয়। তাই বলছিলাম, জিপসী আর ইহুদি ঠিক এক ধরনের অস্তিত্ব নয়। সভ্যতার অঙ্গন দিয়ে অনায়াসে হেঁটে গেল ওরা—নিঃশব্দে, সম্পূর্ণ গা বাঁচিয়ে। যেন আকাশের বুকে উড়ে চলেছে বুনো হাঁসের ঝাঁক। নীচে শতরঞ্চের মতো পৃথিবী। ওদের ছায়া পড়ছে সর্বত্র, কিন্তু ওরা ধরাছোঁয়ার বাইরে। জিপসী কোথাও এখনও শিকড় বিস্তার করতে চাইছে না। এখনও নেশা তার পথে পথে ঘোরা, জননী বসুন্ধরার গালে গাল ঠেকিয়ে কিছুক্ষণ পড়ে থাকা। তারপরই আবার যাত্রার জন্যে নতুন করে তৈরি হওয়া।

কিন্তু আর ক'দিন? আর ক'দিন থাকবে জিপসীর এই স্বাধীনতা?

জিপসী আজ বোধ হয় তার ইতিহাসের গোধূলিতে। সামনে বিষণ্ণ ভবিষ্যৎ। অন্ধকার রাত। গাজো অবশ্য বলবে, সামনে ওদের আলোর দিন। অভিশপ্তের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াবার পালা ফুরাল। জিপসী এবার থেমে দাঁড়াবে। গাড়ির বদলে বাড়ি হবে। বাড়ির সামনে বাগানে ফুল ফুটবে। ওরা মাঠে কিংবা কলে কাজ করবে। সভ্যতার শরিক হবে। সুতরাং, অন্ধকার নয়, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জিপসীর সামনে।

অনেক জিপসী গাড়ির চাকা খুলে ফেলে দিয়ে সত্যি সত্যিই বাড়ি বানিয়ে নিয়েছে। অনেকে সত্যই গৃহস্থ সাজছে। ছেলেমেয়েরা স্কুলে কলেজে পড়তে যাচ্ছে। তাদের মধ্য থেকে চিকিৎসক, সাংবাদিক, লেখক, ব্যবসায়ী, রাজনীতিক বের হচ্ছে। পথের গায়ক-নর্তকীদের নিয়ে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ গড়ে তোলা হচ্ছে, রূপসী জিপসী মেয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্র-তারকা হচ্ছে, ভালুকের বাজিকর সার্কাসের দল গড়ছে, প্রবীণ জিপসী দলপতি দেশের আর পাঁচজন নেতার সঙ্গে পার্লামেন্টে বসে আইন রচনা করছেন। আরও নানা অবিশ্বাস্য কাণ্ডকারখানা। সুতরাং, সভ্য দুনিয়া আজ অতিশয় প্রীত। জিপসীর এই রূপান্তরের পেছনে সে-ই তো জাদুকর।

আপন ক্ষমতা দেখে সভ্যতা যখন অভিভূত, জিপসী কিন্তু তখন মনে মনে অত্যন্ত বিষণ্ণ। সে ভাবতে পারেনি, তার দিন সত্যিই একদিন এমনি করে ফুরিয়ে যাবে। শত শত বছর ধরে জিপসী শাশ্বত বর্তমানের নাগরিক। তার কাছে 'আজ' একমাত্র সত্য। সে গতকালের দিকে তাকাত না, আগামী কালের কথা ভাবত না। এতদিন পরে এবার সে দেখতে পাচ্ছে সামনে তার—আগামী কাল। জিপসী বিমর্ষ বোধ করবে বইকি!

জিপসী পৃথিবীর শেষ ভবঘুরে সম্প্রদায়। স্থায়ী ঘর না থাকলেই কেউ ভবঘুরে হয় না। তবে যে কোনও শহরের অধিকাংশ মানুষকেই ভবঘুরে বলতে হয়। ভবঘুরে বলতে হয় সৈনিক বা সরকারি চাকুরেকেও। কিন্তু ওঁরা ভবঘুরে নন। এমনকি নানা কারণে যারা দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, তা তারা হিপিই হোক, আর

সন্ন্যাসীই হোক, জিপসীর কাছে তাঁরাও ভবঘুরে নন। কেননা, ওঁদের প্রত্যেকেই কিছু সন্ধান করে ফিরছেন, প্রত্যেকেরই সামনে রয়েছে সুনির্দিষ্ট কোনও লক্ষ্য। জিপসী এ-ব্যাপারে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তার জীবন লক্ষ্যহীন। তার এভাবে ঘুরে বেড়াবার পেছনে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণগুলো এখনও যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। কিন্তু স্পষ্ট এই সত্য যে, জিপসী উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন। নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করার কাজে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। সে যেন এখনও আদিম পৃথিবীতে আছে। তার চোখে বিশ্ব এক এবং অখণ্ড; নগর ও জনপদ সব অরণ্য, কিংবা প্রান্তর। এ জীবনকে নিয়েই খুশি ছিল ওরা। সুতরাং সভ্যতার উদ্যোগ আয়োজন দেখে কিঞ্চিৎ বিচলিত বোধ করা ওদের পক্ষে স্বাভাবিক। বুড়ো জিপসী তাই ভ্রাম্যমাণ স্কুল-গাড়িটিকে তাঁবুর সামনে থামতে দেখে আপন মনে বিড়বিড় করে—লেট মি নট গো ব্লেমিন নো বডি, বাট নাউ এ ডেইস হোয়েন ইউ গেটস গিভেন সামথিন দেয়ার ইজ নো বডি এজ আসকস্ ইউ হোয়েদার ইউ ওয়ানট ইট আর নট!—একি আজবকাল রে বাবা, তুমি চাও বা না চাও, লোকে এসে তোমার ভালো করতে চাইবেই।

—কেমন, ভালো নয় কি? জিপসীর জন্য সদ্যগড়া পল্লিটি দেখিয়ে জানতে চাইবেন সমাজ উন্নয়ন দফতরের কর্মী। গড়গড় করে বলে যাবেন, ওদের জন্য সরকার আর কী কী করছেন। ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশেই রয়েছে জিপসীকে সামাজিক মানুষে পরিণত করার বিবিধ কর্মসূচি।

গাজোর ধারণা, ওরা সবচেয়ে ভালো আছে রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে। কারণ, রাষ্ট্র সেখানে অবশিষ্ট সমাজের সঙ্গে জিপসীর সংহতি সাধনে বদ্ধপরিকর। রাশিয়ায় অবশ্য জিপসী কোনও দিনই দুরূহ কোনও সমস্যা বলে গণ্য হয়নি। এমন কোনও বিখ্যাত রুশ কবি বা লেখক নেই, যাঁর রচনায় কোনও না কোনও ভাবে জিপসী উপস্থিত নেই। অনেক বড় ঘরেও নাকি জিপসীর সঙ্গে মেলামেশার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯৫৬ সনে রুশ সরকার নির্দেশ দিয়েছিলেন—যারা এখনও স্থায়ীভাবে কোথাও বসোনি, তারা বসে যাও। সরকার জমি এবং কাজের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। কোনও জিপসী গোষ্ঠী যদি কোনও বিশেষ এলাকায় বাস করতে চায়, তবে তাদের সে-সুযোগ দেওয়া হবে। মস্কো এবং অন্যান্য শহরে জিপসীদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। সে-সব বিদ্যালয়ে রোমানি আর রুশ ভাষা পড়ানো হয়। বয়স্করাও রাত্রে পড়াশুনা করে, কিংবা কারখানার কাজে ট্রেনিং নেয়। মস্কোয় জিপসী থিয়েটার স্থাপিত হয়েছে। ওদের নিয়ে গবেষণাও চলছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেও একই ধরনের বিধি এবং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ওদের মতে জিপসী 'ধনতন্ত্রের অভিশাপ'। প্রথমে ওদের ধারণা ছিল ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটালেই জিপসীর ভাগ্যও পালটাবে, ওরা নিজে থেকে সামাজিক মানুষে পরিণত হবে। বুলগেরিয়া এবং রাশিয়ায় পারিপার্শ্বিকের চাপে অনেক জিপসী অবশ্য সেকালেই তাঁবু ছেড়ে ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু বাদ-বাকিরা তাদের আচরণে জানাল—সাচ্চা জিপসী কখনও এত সহজে হার মানবে না। চেকোশ্লোভাকিয়ার কথাই ধরা যাক। ১৯৫৮ সনে সেখানকার কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন, জিপসীর আলাদা অস্তিত্ব আর স্বীকার করা হবে না। জাতিগতভাবে ওরা কোনও স্বতন্ত্র ধারাবাহী নয়, বিশেষ কিছু চিহ্নযুক্ত এই যা। সুতরাং, এদের সংরক্ষণ না করে সংহতি সাধন করাই ভালো। রোমানি ভাষাকে ওরা রক্ষা বা চর্চাযোগ্য কোনও ভাষা বলে গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। সঙ্গে সঙ্গে জিপসীরা নাকি এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। সরকারি কর্মসূচি নাকি কার্যত প্রায় ব্যর্থ। ১৯৬৫ সনে অতএব গৃহীত হয়েছে নতুন প্রকল্প। লক্ষ্য—জিপসীর ভাগ্যের উন্নতি সাধন। কাজটা যে রীতিমতো জটিল, কর্তৃপক্ষ এতদিনে নাকি সেটা বুঝতে পারছেন। হাঙ্গেরি সরকার নাকি আরও সে কারণেই গড়ে তুলেছেন এক জিপসী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। আশা, তাঁদের পক্ষে আপন সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করা সহজ হবে। স্কুল, কলেজ, নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান—জিপসীদের উদ্যোগে সব প্রস্তুতিই চলছে। কিন্তু জিপসী নাকি সুযোগ পেলেই আবার পথে নেমে পড়তে চাইছে। তবু গাজোর ধারণা, নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা যখন, জিপসী একদিন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় জিপসী পরিচয় হারাতে বাধ্য। বিশেষত, ওসব দেশে জিপসী সম্পর্কে কুসংস্কার যখন অনেক কম এবং সমাজ মোটামুটিভাবে যখন সহানুভূতিসম্পন্ন, তখন জিপসীরা একদিন তার বন্ধনে বাঁধা পড়বেই।

জিপসী-প্রেমিক গাজোর ধারণা, সমাজতান্ত্রিক দেশের চেয়ে জিপসী অনেক বেশি সুখে আছে পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশে। বিশেষত, সুইডেন, স্পেন এবং ব্রিটেনে। কেননা, সেখানে কোনও জবরদস্তি ছাড়াই জিপসীরা আজ সমাজে দিব্যি ঠাঁই করে নিচ্ছে। অথচ একই সঙ্গে তাদের অনেকে ভবঘুরেও থাকছে।

সুইডেনে ১৯১৪ সন থেকে জিপসীর প্রবেশ নিষিদ্ধ। তখন মোটে দু'শ জিপসী ছিল সে দেশে। ১৯৫৪ সনে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। পরের বছর মাথা গুনতি করে জানা যায়, দেশের জিপসীর সংখ্যা সাতশো চল্লিশে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কিছু বর্ণসংকরও আছে। মুষ্টিমেয় ভবঘুরে, অতএব সুইস সরকার ওদের নিয়ে মোটেই ভাবিত নন। ওরা এখনও গান গেয়ে, হাত দেখে টিনের

কাজ করে দিন কাটায়। ঘোড়ার ব্যবসা বন্ধ, অনেকে অতএব পুরনো মোটর গাড়ি কেনা-বেচা করে। ক্যারাভ্যানের পিছনে পিছনে সরকারি স্কুল-গাড়ি ঘুরে বেড়ায়। সরকার ওদের জন্য স্থায়ী বসতি গড়ে তুলছেন। সমাজও ক্রমেই ওদের কাছে টানছে। মিশ্র বিয়ের ঘটনা নাকি দিনকে দিন বাড়ছেই। এবং তার কৃতিত্ব নাকি সুইস মেয়েদের। কনে হয়ে তারাই জিপসী পরিবারে ঢুকছে'

স্পেনে অত্যাচারের দিন ফুরিয়েছে। 'গিতানোস' এখন নাকি সেখানে বেশ আছে। বিশেষ বিশেষ এলাকায় তারা বাস করছে। শহর, গ্রাম কিছুই আর তাদের কাছে নিষিদ্ধ নয়। আর পাঁচজন স্প্যানিশ নাগরিকের মতোই তার মর্যাদা। কোনও কোনও অঞ্চলে খাতির বরং বেশি। কেননা, ওরা নাচে, গায়।

ব্রিটেনে জিপসী আছে পঞ্চাশ হাজার। অবশ্য সকলে সাচ্চা জিপসী নয়। ইংরাজদের কাছে নাকি ভবঘুরে মাত্রই জিপসী। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, পঞ্চাশ হাজারে খাঁটি 'রোম দশ হাজার, দশ হাজার 'পস্-র‍্যাটস' (Post-rats) বা আধা-রোম, দশ হাজার দিদাকাইস (didakais), আর কুড়ি হাজার এমনি সব ভ্রমণকারী, বা দিশি ভবঘুরে। ওরা এখনও বলতে গেলে, প্রায় সকলের মতোই আছে। সেই এক জীবন, এক পেশা। ইংরাজ ওদের স্বাধীনতায় হাত দিতে চায় না। নিজের জন্য তার যে আইন, জিপসীর জন্যও একই আইন। ব্রিটেনে জিপসীর বিশেষ পরিচয়-পত্র দরকার হয় না। তার ক্যারাভ্যান রাখার জন্য এলকো নির্দিষ্ট করে রাখা আছে। শীতে আছে সরকারি উদ্যোগে আস্তানার বন্দোবস্ত। ১৯৬২ সন থেকে সরকারের নির্দেশে কোনও কোনও এলাকা জিপসী ছাউনির জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। কিছু জমি স্থায়ীভাবে ওদের ছেড়ে দেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে। সকলে একবাক্যে স্বীকার করেন—অন্য আগন্তুকদের সম্পর্কে ইংরাজের মনোভাব যা-ই হোক না কেন, জিপসীদের প্রতি তাদের ব্যবহার সত্যই দেখবার মতো। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জিপসী-সংক্রান্ত গবেষণায়ও ইংরাজ আর সকলের পুরোভাগে। ১৮৮৮ সন থেকে ব্রিটেনে কাজ করে চলেছে—জিপসী লোর সোসাইটি। বিশ্বের জিপসী সমাজ তাদের একমাত্র আলোচ্য। হ্যাঁ, আজও।

আমেরিকায় এ-ধরনের সুসংগঠিত আলোচনা-গবেষণার ব্যবস্থা না থাকলেও, জিপসী নাকি সেখানে এক সুখী সম্প্রদায়। বিশাল দেশ। যে দিকেই পা বাড়াও, পথ যেন ফুরোতে চায় না। সাধারণ যাত্রী অন্তহীন পথের কথা ভাবতে ভয় পায়, জিপসী পায় আনন্দ। তাছাড়া, আমেরিকার প্রকৃতিও বর্ণাঢ্য। পথে নানা বৈচিত্র। অতএব জিপসী সেখানে মনের খুশিতে ঘুরে বেড়ায়।

কত জিপসী আছে আমেরিকায়, বলা শক্ত। কেননা, লোক গণনায় ওরা অন্য

'বহিরাগত'দের সঙ্গে এক বন্ধনীভুক্ত। সুতরাং কেউ বলেন—এক লক্ষ, কেউ—দুই লক্ষ। আমেরিকায় এসে নেমেছিল ওরা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দ্বিতীয় তরঙ্গ। কিছু অবশ্য ছড়িয়ে পড়েছে দক্ষিণ আমেরিকায়, কিছু কানাডায়।

আমেরিকার জিপসীদের মধ্যেও অনেক সম্প্রদায়। তবে মোটামুটিভাবে ওদের ভাগ করা যায় দুই ভাগে। একদল গৃহস্থ, অন্যদল যাযাবর। গৃহস্থরা শহর বা শহরতলির এক কোণে দলবদ্ধভাবে বাস করে। তবে সেকালের মতো এখনও ওরা মিস্ত্রি, গায়ক এবং ব্যবসায়ী। ঘোড়ার বদলে অনেকে এখন পুরনো মোটরগাড়ির ব্যবসা করেছে এই যা। আমেরিকার এই শ্রেণির জিপসীরা এখন টেলিফোন, টেলিভিশন ব্যবহার করে, বড় বড় গাড়ি চড়ে, এমনকি ব্যাংকেও নাকি টাকা জমা রাখে। যাযাবররা গায়ক, বাজিকর, জীবজন্তুর শিক্ষক। অনেকে হাতও দেখে। কালিফোর্নিয়ায় তাদের জমজমাট কারবার। সিনেমার প্রযোজক থেকে শুরু করে নায়ক-নায়িকা অনেকেরই ভিড় ওদের আস্তানায়।

তবে ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো, খাঁটি রোম নাকি মার্কিন মুলুকেও কমতির দিকে। বর্ণসংস্কারদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। জাতিগর্বে গর্বিত সাচ্চা জিপসী, গৃহস্থদের মতো ওদেরও পতিত বলে মনে করে—ঘৃণা করে। বলে—ওরা মোটে জিপসীই নয়। দেশময় ছড়িয়ে থাকলেও, নিজেদের মধ্যে ঐক্য নাকি খুবই। জিপসী গর্ব করে বলে—আমাদের কারও কিছু ঘটলে, তা সে মারা যাক আর পুলিশের হাতে ধরাই পড়ুক, বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে সব জিপসী জেনে যাবে। অবশ্য গৃহস্থ আর বর্ণসংকররা জানল কিনা, সেটা তারা বলতে পারে না। ওদের সম্পর্কে প্রকৃত জিপসীদের মোটেই কোনও কৌতূহল বা আগ্রহ নেই।

আমেরিকা জিপসীদের কাছে প্রিয় আরও একটি কারণে। দু'একটি রাজ্য বাদ দিলে সর্বত্র তাদের অবাধগতি। তাছাড়া মার্কিন পুলিশও নাকি খুবই সহানুভূতিশীল। খুব প্রয়োজন না হলে, জিপসীকে তারা মোটেই ঘাঁটায় না। সুতরাং অনেকেরই আশা, জিপসী ধীরে ধীরে একদিন বৃহৎ আমেরিকান জনগোষ্ঠীতে বিলীন হয়ে যাবে। অবশ্য সময় লাগবে। যে-সব জিপসী নানাদেশে গৃহস্থ সেজেছে, তাদের মধ্যেও পথের নেশা মাঝে মাঝে চাড়া দিয়ে ওঠে। বছরে একবার হলেও তারা কিছুদিন ঘরের বাইরে কাটাবেই। ঘরের আসবাবপত্র এবং অন্যান্য গৃহস্থালি আয়োজন দেখেও নাকি মনে হয়—যেন ওরা এখনও ঘোড়ার গাড়িরই বাসিন্দা, ইচ্ছে করলে দু'মিনিটের মধ্যে তারা যাত্রার জন্য তৈরি হতে পারে।

জিপসী এখনও যে-সব দেশে নানা বিধিনিষেধে পীড়িত, তাদের মধ্যে আছে

বেলজিয়াম, ফ্রান্স প্রভৃতি কিছু কিছু দেশ। জিপসী বলে—আমরা সাদা কাক, কিংবা রঙিন খেঁকশিয়াল। অন্য কাক বা শেয়ালেরা আমাদের সইবে কেন? বেলজিয়াম কর্তৃপক্ষের আচরণ নাকি অনেকটা সেই কাকেরই মতো। এখনও নাকি সরকারি ইস্তাহার জারি হয়—জিপসী যতই আমাদের কম নজরে পড়বে দেশের স্বাস্থ্য ততই ভালো হবে। বেলজিয়াম সরকার মনে করেন, জিপসী অশান্তির উৎস। সুতরাং জিপসীর অনুপ্রবেশ সেদেশে নিষিদ্ধ। যারা আগে থেকে আছে, তাদেরও ছলে-বলে-কৌশলে প্রতিবেশি দেশগুলোতে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

বেলজিয়ামে কিছু কিছু জিপসীকে ব্যবসায়ী হিসাবে বসবাসের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু আমরা একটানা আটচল্লিশ ঘণ্টার বেশি কোথাও আস্তানা পাতার সুযোগ পায় না। সরকারের দৃষ্টিতে দেশের সীমানার মধ্যে চলাফেরা করলেও ওরা রাষ্ট্রহীন। প্রতি তিন মাস অন্তর তাই ওদের নতুন করে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে হয়। তাতে লেখা থাকে অমুক নামধারী অমুক, আসলে যে অমুক, অত্র তাকে তিনমাসের মতো নির্দিষ্ট সড়কে চলার সুযোগ দেওয়া হল। স্বভাবতই বেলজিয়ামে জিপসী সন্তান স্কুলে পড়ে না, পড়তে চাইলেও ঠাঁই পায় না।

ফরাসি দেশে আবার ওদের সম্পর্কে দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি। একদিকে শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী কিংবা যাজকেরা যেমন জিপসীর প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল, অন্যদিকে জনসাধারণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের মনে এখনও নাকি ওদের সম্পর্কে নানা কুসংস্কার। তাদের কাছে জিপসী এখনও অচ্ছুত, তাদের ছোঁয়া এড়িয়ে চলাই ভালো। ফরাসি দেশেও জিপসীরা অনেকে ধীরে ধীরে স্থির হয়ে বসছে। কিন্তু শহরের এক কোণে পাশাপাশি তাদের বাস। গাজোরা সেদিকে বড় একটা যায় না। ওদের নিজেদের কাফে, দোকান ইত্যাদি আছে। কিন্তু কদাচিৎ সেখানে কোনও গাজোকে দেখা যায়। শোনা যায়, দক্ষিণ ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ জিপসী সম্পর্কে অনেক উদার। কিন্তু সেখানেও জিপসী ক্যারাভান চোখে পড়া মাত্র গৃহস্থ ছুটে গিয়ে দরজায় খিল দেয়। মুরগি, ভেড়া এবং ছেলেপুলেদের চোখে চোখে রাখে। কোনও কোনও স্পষ্টবাদী ফরাসির ধারণা—এই আচরণের পিছনে বর্ণ বা জাতিদ্বেষও সক্রিয়। এমনকি ফরাসি সরকারও নাকি বর্ণাঢ্য এক জিপসী সম্প্রদায়ের প্রতি আপন কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করছেন না। এখনও জিপসী শাসন করছেন তাঁরা ১৯১২ সনে রচিত আইন দিয়ে!

সে আইন মোতাবেক প্রত্যেক জিপসী ভবঘুরে। তার দেশ নেই, জাতি-পরিচয় নেই, স্থায়ী পেশা নেই। সুতরাং, পুলিশ সব সময় তাদের চোখে চোখে রাখে। জিপসীকে তাদের কাছ থেকে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে হয়। সেটি নাকি একটি

অপমানকর দলিল। তাতে নাম, ডাকনাম, জন্মস্থান, কোন্ দেশ থেকে আসা হয়েছে এসব ছাড়াও থাকে উচ্চতা, বুকের মাপ, দাড়ির মাপ, ডান কান এবং বাঁ পায়ের দৈর্ঘ্য, চোখের রং—ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিস্তারিত তথ্য তৎসহ দুই-দুইটি ফটো! তা দেখালেও জিপসীর নিষ্কৃতি নেই। কোনও জায়গায় সে থামতে চাইলে, প্রথমে তাকে থানায় গিয়ে সে বাসনা প্রকাশ করতে হবে, কিংবা অন্য কোনও কর্তৃপক্ষের দুয়ারে গিয়ে ধরনা দিতে হবে। সে জায়গা ছাড়তে হলেও অনুমতি চাই। এই অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে অনেক হৃদয়বান্ ফরাসি আপত্তি জানিয়েছেন। জিপসীদের সম্পর্কে ভুল ধারণা ভাঙবার জন্য লেখক, সাংবাদিকেরাও চেষ্টা করছেন। ফ্রান্সে একজন বিখ্যাত জিপসী লেখকও আছেন। তাছাড়া, ব্রিটেনের জিপসী লোর সোসাইটির মতো ফরাসিদেশেও গড়ে উঠেছে এক বিদ্বৎসভা। তাঁদের আলোচনা ও গবেষণা বিষয়ও—জিপসী।

চারদিকে আজ যা চলছে তাতে মনে হয়, সুখদুঃখের মধ্য দিয়ে জিপসী ধীরে ধীরে সভ্যতার হৃদয়ের দিকেই এগিয়ে চলেছে। তার এক রক্ষাকবচ ছিল দারিদ্র। ধীরে ধীরে সে বর্ম খসে পড়ছে। জিপসী গাজোর বরাদ্দ করা পেশায় হাত লাগাতে বাধ্য হচ্ছে, তার পকেটে নোটের তাড়া ক্রমেই ভারী হচ্ছে। তার এক ভরসা ছিল ভাষা। তাতেও ভেজাল ঢুকছে। জিপসী বলত, চারদিকে গাজো যখন ঘিরে ধরে, জিপসীর প্রতিরক্ষা প্রাচীর তখন তার ভাষা। সে বলত—সত্য একমাত্র রোমানির জিহ্বায়ই প্রকাশ করা সম্ভব। আজ সংসর্গ-দোষে সে ভাষার পবিত্রতা ক্রমেই ক্ষুণ্ণ। আরমিনের উপন্যাসের উপসংহার শুনে হেসেছিল জিপসী। নবীন নায়ক আবির্ভূত হবে হৃদয়বান্ কোনও সম্রাটের প্রাসাদ থেকে। তার মা কোনও জিপসী রূপসী। হেসে জিপসী বলেছিল, তারা সে তত্ত্বে বিশ্বাস করে না। জিপসী একসঙ্গে দুই ঘোড়ায় চড়তে চায় না। সগর্বে তারা ঘোষণা করেছিল—যেদিন পশ্চিম পৃথিবী পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, সেদিন তার অবশেষ যেটুকু থাকবে, তাই কুড়োতে কুড়োতে আবার আমরা পুবের পথ ধরব। জিপসীর সে স্বপ্নও বুঝি টুটে যায়-যায়।

সেটাই স্বাভাবিক। চিরকাল পারিপার্শ্বিকের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। ছায়াপাত অনিবার্য। জিপসীর সাধ্য কি অমোঘ নিয়তি বরাবর সে ফাঁকি দেয়। তাছাড়া অন্যরা তা মানবেই বা কেন? জিপসী প্রবাদ—দাঁড়িয়ে থাকা গোরু দুইতে সুবিধে। গাজো তার কাছে স্থবির কামধেনু। ঠিক তেমনই গাজোর চোখে জিপসী আবার এক মস্ত চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। যারা গৃহস্থ, একদিকে

যেমন তারা ভবঘুরেকে ঈর্ষা করে, অন্যদিকে যাযাবরকে সে ভয়ও পায়। কেননা, ভবঘুরেরা নশ্বরতার কথা বলে, ওরা শান্তির শত্রু, স্থিতির শত্রু—গৃহস্থের শত্রু। তাছাড়া ইতিহাসও কানে কানে জানিয়ে দিয়েছে দুনিয়ার গৃহস্থকুলকে, কাউকে অনন্তকাল পথে ফেলে রাখতে নেই। কেননা, তাদের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। তখন তোমার পক্ষে সব নিয়ে সুস্থির সুখী জীবন যাপন করা শক্ত হয়ে উঠতে পারে। গৃহস্থ-দুনিয়া অতএব সে-কারণেও জিপসীকে ধর্মান্তরিত করার জন্য আজ এমন ব্যাকুল।

বেচারা জিপসী। সে বলত—সৃষ্টির কাজ শেষ হয়ে গেলে ঈশ্বর ছোট্ট দুটি মানুষ গড়লেন। একটি মেয়ে, অন্যটি পুরুষ। ওরাই জিপসী। মানুষ যেমন ভালো কিছু তৈরি করে অনেক ভেবেচিন্তে, তদুপরি আর একটা কিছু জুড়ে দেয়, ঠিক সেভাবেই পৃথিবীর বুকে ছেড়ে দিয়েছিলেন আমাদের। যেন দুটি অলংকার। সুন্দর পৃথিবী তাই না আরও সুন্দর।

কিন্তু হায়, সভ্যতা তা বুঝল কই!

নির্দেশিকা

জিপসীদের সম্পর্কে ইংরেজি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনেক বই আছে। ১৯১৪ সনে ব্রিটেনের 'জিপসী লোর সোসাইটি' জিপসী সংক্রান্ত পুঁথিপত্রের একটি তালিকা প্রকাশ করেছিলেন। জর্জ ব্ল্যাক কর্তৃক প্রস্তুত সে গ্রন্থপঞ্জিতে (Black, George. F.—A Gypsy Bibliography) ৪৫৭৭টি পুঁথি এবং প্রবন্ধের নাম ছিল। তারপরও অনেক বই বেরিয়েছে। ইউরোপে জিপসী চর্চা এখনও অব্যাহত। আমি যে-সব বই পড়েছি বা দেখেছি তার একটি নির্বাচিত তালিকা এখানে দেওয়া হল। অনিবার্য কারণেই তালিকাটি ইংরেজি গ্রন্থের। বাংলা ভাষায় জিপসী সংক্রান্ত কোনও বইয়ের সন্ধান আমি পাইনি। 'মহুয়া' গীতিকাব্য মাত্র।

তালিকাটিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা হল। প্রথম অংশে দেওয়া হল সে সব বইয়ের নাম, যাতে বিশেষভাবে জিপসীর ইতিহাস, তাদের রীতিনীতি, জীবন ও জীবিকার কথা বিবৃত। জর্জ বরো'র অধিকাংশ রচনা উপন্যাসাকারে পরিবেশিত হলেও এই অংশই উল্লেখ করা হল। কেননা, কাহিনি নয়, তথ্যই এগুলোর প্রধান সম্পদ। দ্বিতীয় অংশে, বিশেষভাবে জিপসী ভাষা যে সব গ্রন্থের আলোচ্য এমন কয়টি বইয়ের নাম দেওয়া হল। তৃতীয় অংশে দেওয়া হল, যে সব বইয়ে জিপসী উপকথা, সংগীত এবং প্রবাদ প্রবচন ইত্যাদি পাওয়া যাবে তেমন কিছু বইয়ের সন্ধান। আর চতুর্থ অংশে দেওয়া হল ভারতীয় যাযাবরদের খবরাখবর মেলে এমন কিছু বইয়ের নাম। ভারতের বিভিন্ন উপজাতি এবং সম্প্রদায় সম্পর্কে পুঁথিপত্রের অভাব নেই। যেসব রচনায় প্রসঙ্গত ইউরোপীয় জিপসীদের কথাও আলোচনা করা হয়েছে, আমি বিশেষভাবে তারই কিছু কিছু উল্লেখ করেছি মাত্র।

|| ১ ||

Borrow, George : The Zincali or An Account of Gypsies of Spain (1841)

The Bible in Spain (1843).

Lavengro. The Scholar, The Gypsy, The Priest (1851).

The Romany Rye (New Ed., 1914)

Pocket George Borrow.

Meyers, R. Robert : George Borrow (1966)

Leland, Charles, G : The Gypsies (1882)

Gypsy Sorcery and Fortune Telling (New Ed., 1964)

Simson, Walter : History of the Gypsies (1865)
Block, Martin : Gypsies (1938)
Starkie, Walter : In Sarah's Tent (1954)
Scholars and Gypsies (1963)
Pennell, E.R. (Ed) : The Gypsies (1924)
Brown, Irving : Gypsy Fires in America (1930)
Bercovici, K : The Story of the Gypsies (1928)
Vessy-Fitzgerald, B : Gypsies of Britain (1944)
Webb, G.E.C : Gypsies : The Secret People.
Chaman Lal : Gypsies – Forgotten Children of India (1962)
Clebert, Jean-Paul : The Gypsies (1963).
Yoors, J : The Gypsies (1967)
Duff, Charles : A Mysterious People (1969)
Esty Katherine : The Gypsies : Wanderers of Time (1969)
Lazell, David : From Far East I came (1970)
Kenrick D. & Puxon, G : The Destiny of European Gypsies (1973)

|| ২ ||

The Slang Dictonary (1873)

Smart, B.C. & Crofton H.T : The Dialect of the English Gypsies (1875)

Borrow, George : Romany, Lavo Lil : The Word book of Romany (1874)

Leland, Charles, G : The English Gypsies and their Language (1873).

Turner, R.L. : Position of Romani in Indo Aryan Languages (1927).

|| ৩ ||

Groome, H.F : Gypsy Folk Tales (1899)
Brown, Irving : Deep Song.
Yates, D.E. (Ed) : A Book of Gypsy Folk Tales (1948)
Macalister, Donald : Romani Versions.

Hampden John : The Yellow Dragon and other Gypsy Folk-Tales (1969)

Kochanowaski, J. Gypsy Studies, Part II (1963)
Lawrence. D.H. : Virgin and the Gypsy.

Maximoff, M. : The Ursitory (1948).
Strange, Dorothy : Born on the Straw (1969)
দীনেশচন্দ্র সেন বাংলার পুরনারী (১৯৩৯)

।। ৪ ।।

David, M. (Ed.) : Account of Gypsies in India.
Grierson, G.A. : Linguistic Survey of India, Vol. XI, Gypsy Language (1922)
Bhargava, B.S. : The Criminal Tribes (1949)
Raghavish, V. : Nomads (1968)
Singh, Sher : The Sikligars of Punjab.
Robinson, Capt. J.A : Notes on Nomad Tribes of Eastern Afganistan (1935).
Pirani, Cyrus : The Gypsies of Iran (1969)
Cumberlege H.R. : Some Account of the Bunjarrah Class (1882)
এ ছাড়া : Journal of Gypsy Lore Society তে নানা সময়ে প্রকাশিত নিম্নোক্ত প্রবন্ধাবলী
Williamson, H.L. : The Criminal and Wandering Tribes of India.
Brown, Irving : Roms and Doms.
Father Anastas : The Nawer or the Gypsies of the East.
Arnold, Herman : Some Observations on the Turkish and Persian Gypsies.
Mox. F : The So called Gypsies of India.
Tipler, Derek : The Banjara.

কোন রচনাটি কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, তা উল্লেখ করা হল না এ কারণে যে, জিপসী সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে ব্রিটেনের জিপসী লোর সোসাইটির প্রতিটি সংখ্যাই অবশ্যপাঠ্য। সাময়িক কিছুদিনের ছেদ বাদ দিলে ১৮৮৮ সন থেকে পত্রটি এখনও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। আমি ১৯৭২ সন পর্যন্ত প্রকাশিত প্রতিটি সংখ্যাই দেখেছি। 'ক্যুরিয়ার' (প্যারিস) নিউ ইয়র্কার' (নিউইয়র্ক) প্রভৃতি কোনও কোনও সাময়িক পত্রও আমি ব্যবহার করেছি। ডব্লিউ আর ঋষির প্রবন্ধটি (Gypsies—W.R. Rishi) প্রকাশিত হয়েছিল 'দি ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া' (বোম্বাই) জুন, ১৯৭২ সনে।